সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা

২০১৪ সালে মিডিয়াতে সিপিডি'র নির্বাচিত মন্তব্যসমূহ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা

২০১৪ সালে মিডিয়াতে
সিপিডি'র নির্বাচিত মন্তব্যসমূহ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি - ৬/২ (৭ ও ৮ তলা), ব্লক - এফ
কাজী নজরুল ইসলাম রোড, লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট
ঢাকা - ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২, ৯১৪৩৩২৬, ৮১২৪৭৭০
ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৮১৩০৯৫১ ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

স্বত্ব
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারগুলোতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবে লেখকদের নিজস্ব। এর সাথে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে।

প্রচ্ছদ
অভ্র ভট্টাচার্য

অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাস
ফজলে রাব্বি সাকিল
মোঃ সাইফুল হাসান

ISBN 978-984-8946-20-6

মূল্য
৩০০ টাকা

মুদ্রক
এনরিচ প্রিন্টার্স
৪১/৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

C12015_1SOM_SPE

সিপিডি পরিচিতি

বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় অধ্যাপক রেহমান সোবহানের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিডি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অংশীদারিত্ব ও জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্য পূরণে সিপিডি গবেষণা, বিশ্লেষণ ও সংলাপ আয়োজনসহ বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে আসছে।

সিপিডি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে নিয়মিত সংলাপ পরিচালনা করে থাকে যার মাধ্যমে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে মুক্ত আলোচনার সপক্ষে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সিপিডি সবসময় সচেষ্ট। সংলাপ প্রক্রিয়ার তত্ত্ব ও তথ্যগত ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সিপিডি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। সিপিডিতে চলমান গবেষণাসমূহের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে: সামষ্টিক অর্থনীতি পর্যালোচনা; দারিদ্র্য, অসমতা ও সামাজিক নিরাপত্তা; কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন; বিনিয়োগের প্রসার এবং শিল্প কারখানা ও অবকাঠামোর উন্নয়ন; বাণিজ্য, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিশ্বায়ন; জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ; উন্নয়নের জন্য সুশাসন, নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠান; এবং ২০১৫-পরবর্তী বিশ্ব উন্নয়ন এজেন্ডা।

উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নিয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামের আলোচনায় সিপিডি নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে সিপিডি দুটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের কার্যক্রম পরিচালনায় নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং এদের সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘের চতুর্থ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সম্মেলনে ঘোষিত কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন গতিচিত্র পরিবীক্ষণকল্পে গঠিত একটি স্বাধীন পার্টনারশীপ, LDC IV Monitor। অপরটি হলো আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার ৪৮টি থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সম্মিলিত একটি নেটওয়ার্ক, Southern Voice on Post-MDG International Development Goals, যা মূলত ২০১৫-পরবর্তী বিশ্ব উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণী আলোচনাতে 'উন্নয়ন দক্ষিণ'-এর কণ্ঠস্বরকে উপস্থাপন করার প্রয়াসে গঠিত।

নীতি গবেষণা ও সংলাপের ক্ষেত্রে পরিচালিত কার্যক্রম ও সার্বিক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ Think Tank Initiative-এর আওতায় বিশ্বব্যাপী এক প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার জন্য সিপিডি পর পর দুইবার নির্বাচিত হয়েছে। সিপিডি প্রকাশিত বই, মনোগ্রাফ, ওয়ার্কিং পেপার, সংলাপ প্রতিবেদন এবং সংক্ষিপ্ত নীতি পরামর্শপত্রের সংখ্যা ইতিমধ্যে ৩৮০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এসব প্রকাশনা সিপিডির নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র এবং বাংলাদেশের নির্বাচিত কিছু বইয়ের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। সিপিডির প্রকাশনা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি নিয়মিতভাবে সিপিডির ওয়েবসাইটে (www.cpd.org.bd) প্রকাশ করা হয়।

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সম্মাননীয় ফেলো

অধ্যাপক রওনক জাহান
সম্মাননীয় ফেলো

ড. ফাহমিদা খাতুন
গবেষণা পরিচালক

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক

জনাব কিশোর কুমার বসাক
জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ইস্যু নিয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) পরিচালিত গবেষণাকর্মের ওপর ভিত্তি করে সিপিডি-র জ্যেষ্ঠ গবেষকরা নিয়মিতভাবে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মাধ্যমসমূহে তাদের বিশেষজ্ঞ মতামত তুলে ধরেন, পত্র-পত্রিকায় কলাম লিখেন এবং সাক্ষাৎকার প্রদান করে থাকেন। সিপিডি তার গবেষণা ফলাফলকে বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনের নিরীখে এবং নীতি প্রণয়নে অবদান রাখার প্রেক্ষিত থেকে এ ধরনের কার্যক্রমকে সবসময় গুরুত্ব দিয়ে আসছে। অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়ন, কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি, সেবা খাত, কর্মসংস্থান, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীর স্বার্থ – অর্থনীতির এসব বিভিন্ন খাতের ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সিপিডি-র গবেষকদের এসব বিশ্লেষণী বক্তব্য ও মন্তব্য সাধারণ মানুষ আগ্রহ নিয়ে পড়ে থাকেন, শুনেন, আলোচনা করেন।

বর্তমান গ্রন্থটি সিপিডি-র গবেষকদের ২০১৪ সালে প্রকাশিত কিছু নির্বাচিত কলাম ও মন্তব্য ধারণ করেছে যা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব লেখায় সমসাময়িক বিষয়াবলী নিয়ে তাদের গবেষণাপ্রসূত মন্তব্যের প্রতিফলন যেমন ঘটেছে, তেমনি প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশের মধ্য-দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে তাদের মতামতের। চলমান বেশ কিছু বিতর্কের প্রেক্ষিতে সিপিডি-র গবেষকদের অবস্থান ও মন্তব্যও এসব লেখায় স্থান পেয়েছে। যেমন স্বল্পোন্নত বনাম মধ্য-আয়ের দেশ সম্পর্কিত বিতর্ক, জিডিপির পরিমাপ নিয়ে মতভিন্নতা। বিকাশমান বাংলাদেশ অর্থনীতির সম্ভাবনা, বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিক সহযোগিতার সুযোগ কাজে লাগানোর কৌশল নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন লেখায়। একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বক্ষমান সব লেখাকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে, আর তা হলো বাংলাদেশের দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ ও পথ-অনুসন্ধান, যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া হবে উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত, বণ্টনের বিষয়ে সজাগ, এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত।

বর্তমান গ্রন্থে সিপিডি গবেষকদের নির্বাচিত মতামতগুলোকে বিষয়বস্তুমাফিক বিন্যাস করে ছয়টি পৃথক অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিত' শিরোনামে প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাস ও আগামীর পথে চ্যালেঞ্জ, রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকার বিবর্তন, দুর্বলতা ও এক্ষেত্রে করণীয়, রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং অর্থনীতি ও বিনিয়োগের ওপর সাংঘর্ষিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার নেতিবাচক অভিঘাত ও তার প্রেক্ষিতে সমঝোতাভিত্তিক রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা। এ অধ্যায়ে সরকারের সামনে ২০১৪ সালের মূল মূল চ্যালেঞ্জগুলো এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অনুকূল ও ইতিবাচক রাজনীতির প্রয়োজনীয়তার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

সিপিডি-র গবেষণার একটি প্রধান বিষয় চলমান অর্থবছরের বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশ্লেষণ ও আলোচনা যার মধ্যে আছে বাজেটের কাঠামো ও গুণগত মান, রাজস্ব আয়-ব্যয়ের প্রাক্কলনের যথার্থতা, রাজস্ব নীতি, কর প্রস্তাব ও তার সম্ভাব্য অভিঘাত, এবং কর প্রস্তাব বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে সুপারিশ। 'অর্থনৈতিক প্রবণতা ও জাতীয় বাজেট ২০১৫' শিরোনামে দ্বিতীয় অধ্যায়ের লেখাগুলোতে এসব বিষয়ে মতামতের প্রতিফলন রয়েছে। 'মানবসম্পদ ও নাগরিক অধিকার' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ের সন্নিবেশিত লেখাসমূহে মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনা কাজে লাগানোর কথা বলা হয়েছে, নারীদের কাজের যথার্থ মূল্যায়নের তাগিদ দেওয়া হয়েছে, শ্রমিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজার মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ১,১৩৬ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন, অনেক শ্রমিক পঙ্গুত্ব বরণ করেন, জীবিকা নির্বাহের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন অনেক শ্রমিক। নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ, আহতদের সুচিকিৎসা প্রদান এবং রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, মানসম্পন্ন মজুরি ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ, দাবি-দাওয়া প্রণয়ন ও নীতি পরামর্শ প্রদানের জন্য সিপিডি ১৪টি সংগঠনের সাথে যৌথভাবে 'রানা প্লাজা-পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে নাগরিক সমাজের উদ্যোগ' শীর্ষক একটি কার্যক্রম হাতে নেয়। 'রানা প্লাজা' শিরোনামে চতুর্থ অধ্যায়ে এ কার্যক্রমের অধীনে পর্যালোচিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমবর্ধমান হারে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে, যা একদিকে সুযোগ সৃষ্টি করছে বর্ধিত বাজারের আর বিনিয়োগের, আর অন্যদিকে প্রতিযোগিতাসক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক-আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য অবকাঠামো ও বাণিজ্য-সহজীকরণের ক্ষেত্রে নতুন চাহিদার সৃষ্টি করছে। এসব বিষয়ে মতামত উঠে এসেছে 'বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা' শিরোনামের পঞ্চম অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায় 'স্মরণ'-এ গ্রন্থিত হয়েছে দুজন বিশেষ ব্যক্তিত্বকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক লেখা। ড. এম রহমতুল্লাহ ছিলেন সিপিডি পরিবারেরই একজন যাঁকে আমরা হারিয়েছি ২০১৪ সালে। এসকাপের শীর্ষ কর্মকর্তা হিসেবে ও পরবর্তীতে সিপিডি-র গবেষণাকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে তিনি দক্ষিণ এশিয়া ও বৃহত্তর এশীয় অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিবিড় করার জন্য তাঁর বিশ্লেষণ, মতামত ও লেখনীর মাধ্যমে অনন্যসাধারণ ভূমিকা রেখে গেছেন। আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার মাধ্যমে আমাদের দেশের ভৌগলিক অবস্থানের সুযোগ কীভাবে আমরা কৌশলীভাবে কাজে লাগাতে পারব, এসব বিষয়ে তাঁর রেখে যাওয়া গবেষণা ও পরামর্শ আগামীতেও আমাদের দিক-নির্দেশনা দিতে থাকবে। প্রয়াত কমরেড ফরহাদ ছিলেন আমাদের দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব; ঊনষত্তরের গণঅভ্যুত্থান,

একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলনে যাঁর অগ্রণী ভূমিকা ও নেতৃত্ব আমরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ সমাজ ও বৃহত্তর জনমানুষের কাছে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণালব্ধ বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সিপিডি ভবিষ্যতে আরও উদ্যোগী হওয়ার আশা রাখে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সিপিডি-র গবেষণাকর্ম বাংলা ভাষায় বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যেসব পত্রিকা সিপিডি-র গবেষকদের সুযোগ করে দিয়েছেন, এ গ্রন্থের সকল লেখকের পক্ষ থেকে আমি সেসব পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলোকে গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করে প্রকাশের জন্য উপযোগী ও প্রস্তুত করার পর্যায়ে ক্ষেত্র-বিশেষে কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্তন করতে হয়েছে।

সিপিডি-র ডায়লগ ও কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীরা এ সংকলন প্রকাশের জন্য অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন। লেখা ও মন্তব্যসমূহের নির্বাচন ও বাছাই, সেগুলোর বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যাস ও পরিমার্জন করে প্রকাশের উপযোগী করে তোলা – প্রকাশনার প্রতিটি পর্যায়ে তারা প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। সিপিডি-র ডায়লগ ও কমিউনিকেশন বিভাগের প্রধান *মিজ আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ* এক্ষেত্রে সার্বিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। ডায়লগ ও কমিউনিকেশন বিভাগের উপপরিচালকবৃন্দ *জনাব অভ্র ভট্টাচার্য* ও *মিজ নাজমাতুন নূর*, এবং প্রকাশনা সহযোগী *জনাব মাবরুক মোহাম্মদ* সংকলনটির প্রকাশে মূল ভূমিকা রেখেছেন। সিপিডি-র এসব সহকর্মীর প্রত্যেকের জন্য রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

সিপিডি-র গবেষকদের কলাম, সাক্ষাৎকার ও মন্তব্য বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক আলোচনা-সমালোচনা-বিতর্ককে যুক্তি ও তথ্যভিত্তিক করার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে ও সমৃদ্ধ করবে, এ আশা রাখি।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

মোস্তাফিজুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সূচিপত্র

মুখবন্ধ *সাত*

অধ্যায় ১: জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের সংগ্রামে আমার অংশগ্রহণ ৩
রেহমান সোবহান

আরেক অনিশ্চয়তার দিকে যাচ্ছি ৮
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

কার্যকর গণতন্ত্রচর্চায় আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে উদাসীনতা লক্ষণীয় ১২
রওনক জাহান

গণতন্ত্রকে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে ১৯
রেহমান সোবহান

বাংলাদেশের গণতন্ত্রচর্চার পুনর্ভাবনা ২১
রেহমান সোবহান

সমঝোতা, সহনশীলতা বাড়ানো প্রয়োজন ২৫
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সুশীল সমাজের প্রভাব আগের চেয়ে কমেছে ২৬
রেহমান সোবহান

রাজনৈতিক দল: তখন ও এখন ৩৪
রওনক জাহান

মধ্যম আয়ের দেশ বনাম স্বল্পোন্নত দেশ ৩৯
ফাহমিদা খাতুন

নেতৃত্বের সৃজনশীলতা ও মধ্যবিত্তের উদ্যম সময়ের দাবি ৪৩
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অর্থনৈতিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে প্রয়োজন সরকারি উদ্যোগ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ৫০
মোস্তাফিজুর রহমান

প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন রাজনৈতিক পরিবেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কতটুকু সম্ভব? ৫৩
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার সংশয়ে বিনিয়োগ বাড়েনি ৫৭
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য কাঙ্ক্ষিত সক্ষমতা ৫৯
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এবং *কিশোর কুমার বসাক*

তিন বড় চ্যালেঞ্জে নতুন সরকার ৬৩
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

রাজনৈতিক অস্থিরতা পোশাকশিল্পের অগ্রগতিতে অন্তরায় ৬৬
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অধ্যায় ২: অর্থনৈতিক প্রবণতা ও জাতীয় বাজেট ২০১৫

কর আদায় বাড়াতে হবে ৭৩
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

এবারের বাজেট: কী চাই, কেন চাই ৭৪
ফাহমিদা খাতুন

রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জন কঠিন হবে ৭৭
মোস্তাফিজুর রহমান

বাস্তবসম্মত বাজেটের জন্য চাই গতিশীল অর্থনীতি ৮১
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ব্যক্তি খাতের আস্থাহীনতা কাটাতে হবে ৮৪
মোস্তাফিজুর রহমান

বাজেট প্রস্তাব ২০১৪-১৫: মতামত ও সুপারিশ আমলে নিন ৮৯
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বিনিয়োগে আস্থার সংকট কাটাতে হবে ৯২
মোস্তাফিজুর রহমান

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে কিছু পদক্ষেপ পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন ৯৪
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বাজেটের গুণগত উৎকর্ষের দিক মাথায় রাখতে হবে ১০১
মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যায় ৩: মানবসম্পদ ও নাগরিক অধিকার

সম্ভাবনার প্রজন্ম: মানবসম্পদ ১০৭
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

২০২১ সালে ৫০ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি: সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল ঠিক করতে হবে — ১১০
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

নারীর কাজের যথার্থ মূল্যায়ন হোক — ১১২
ফাহমিদা খাতুন

পরিবর্তনশীল শ্রমবাজারের নিরীখে গতিশীল ট্রেড ইউনিয়ন: কিছু নির্বাচিত ভাবনা — ১১৮
মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যায় ৪: রানা প্লাজা

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার নয় মাস: প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কত দূর? — ১২৭
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

রানা প্লাজা-পরবর্তী উদ্যোগে সমন্বয়হীনতা রয়েছে — ১৩৩
মোস্তাফিজুর রহমান

ব্যর্থতা আসলে সব পক্ষের — ১৩৮
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

রানা প্লাজা ধস ও পোশাকশিল্পের ভবিষ্যৎ — ১৪০
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অধ্যায় ৫: বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা

বাংলাদেশে বিদেশি সাহায্যের ভূমিকা — ১৪৭
ফাহমিদা খাতুন

সুযোগকে সতর্কতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে — ১৫০
মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ — ১৫৪
ফাহমিদা খাতুন

বিমসটেক: পারস্পরিক সহযোগিতার এক নতুন দিগন্ত — ১৫৭
মোস্তাফিজুর রহমান

মার্কিন বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা বাংলাদেশের ন্যায্য দাবি — ১৬৪
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অধ্যায় ৬: স্মরণ

ড. এম রহমতউল্লাহ: দেশের উন্নয়নে তাঁর অবদান স্মরণীয় ১৭১
মোস্তাফিজুর রহমান

কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ ১৭৪
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যায় ১

জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের সংগ্রামে আমার অংশগ্রহণ

রেহমান সোবহান

১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে আমার কর্মজীবন শুরু হয়। সে সময় পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যায্য চরিত্র শুধু অর্থনীতির ছাত্রদের কাছেই পরিষ্কার ছিল না, আমাদের জনজীবনের সব ক্ষেত্রেই তা অনুভূত হতো। বাঙালিদের অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও রাজনৈতিক অধীনতা ছিল তখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কক্ষ পর্যন্ত সবখানেই এসব বিষয়ে আলোচনা হতো। অর্থনীতিবিদ হিসেবে আমরা বিষয়টির অর্থনৈতিক তাৎপর্য নিয়েই বেশি মাথা ঘামাতাম, তবে সব আলোচনাই শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক আচরণের দিকে মোড় নিত।

আমাদের সবার 'স্যার' অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের কাছ থেকে আমরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারতাম। ১৯৬০ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে পাকিস্তান রাষ্ট্র সম্পর্কে আমার সম্যকভাবে জানার সুযোগ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের চালচিত্র বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্সট্রাকশনের দায়িত্বে প্রকাশিতব্য একটি বইয়ে আমাকে অর্থনীতি নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছিল মূলত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের গুণকীর্তন করার জন্য। আমার লেখাটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু আমি এতে সরকারি নীতির দুর্বলতা এবং এর পরিণতিতে পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনার বিষয়টি তুলে ধরেছিলাম। আমার লেখাটি নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কারণ, তারা অবিলম্বে সেই বইটি তুলে নিয়ে আমার লেখাটি বাদ দিয়ে ড. আবদুল্লাহ ফারুকের একটি 'ইতিবাচক' প্রবন্ধ যুক্ত করে বইটি প্রকাশ করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোগত বৈষম্যের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনার কারণ নিহিত ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের আকারে পরে তা চিরস্থায়িত্ব পায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সব ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানি অভিজাতদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। এর সমাধান হিসেবে অর্থনীতিবিদেরা প্রস্তাব করেছিলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নীতি প্রণয়নের বিষয়টি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সাংবিধানিকভাবে পৃথক করা হোক। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদানের মধ্য দিয়ে যা বাস্তবায়ন করা হবে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে ক্ষমতার এই পৃথকীকরণের ব্যাপারটি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবির মধ্যেই ছিল। অর্থনীতিবিদেরা যে এই বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করলেন, এর পেছনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদেরও একটি বড় ভূমিকা ছিল। কারণ, তাঁরা বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে তুলে ধরেছিলেন বলেই অর্থনীতিবিদেরা এ বিষয়ে লেখালেখি করার ভিত্তি পেয়েছিলেন। আর ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ করেন, তাও অনেকাংশে ছিল অর্থনৈতিক দাবি। ছয় দফা আসলে বাঙালি অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিকদের মধ্যকার সমন্বয়ের ফসল।

ষাটের দশকে আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে যে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে আমি অংশ নিয়েছি। লাহোর ও ঢাকায় অনুষ্ঠিত দুটি সেমিনারে পাকিস্তানের এই দুই অর্থনীতির ওপর আলোকপাত করে যে প্রবন্ধ আমি পড়ি, তার ফলেই পেশাদার অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করি। লাহোরে ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুই অর্থনীতির তত্ত্বে একটি অঞ্চলের বিশেষ সমস্যা মোকাবিলায় করণীয় হিসেবে আমি পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছিলাম। পরবর্তীকালে সেই প্রবন্ধটি ঢাকার প্রধান ইংরেজি দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার-এ প্রকাশিত হয়, এমনকি পত্রিকাটি তাদের শিরোনামও করে এই প্রবন্ধটিকে উল্লেখ করে। তবে এই ধারণাটি যে একা আমার মস্তিষ্কপ্রসূত, ব্যাপারটি মোটেও তা নয়। বাংলাদেশের বহু বুদ্ধিজীবী যেমন অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, ড. সাদেক, অধ্যাপক এম এন হুদা, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক আখলাকুর রহমান, অধ্যাপক আনিসুর রহমান, অধ্যাপক আবু মাহমুদ, ড. হাবিবুর রহমানসহ অন্যরাও এতে অবদান রেখেছেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভেতরে এই বৈষম্য নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমিসহ আরও কয়েকজন অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ি। এর ফলে আমরা সরাসরি বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে

সম্পৃক্ত হয়ে যাই। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনার জন্য নুরুল ইসলামসহ আমাকে যখন অর্থনীতিবিদদের প্যানেলে ডাকা হলো, তখন আমরা ইতিমধ্যে একটি রাজনৈতিক সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছি। সেটা নিছক বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডলের কোনো ব্যাপার ছিল না।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করলে বঙ্গবন্ধু নুরুল ইসলাম, আনিসুর রহমান, কামাল হোসেন, মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী, খান সারওয়ার মুরশিদসহ আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন, তাঁর ও আওয়ামী লীগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসে ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করার জন্য। ছয় দফার কয়েকটি দফার বাস্তব রূপায়ণ করতে গিয়ে আমাদের টেকনিক্যাল আলোচনা করতে হয়েছে: ভিন্ন মুদ্রা প্রচলন, বাণিজ্য ও অনুদানের ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি।

সেখানে এমন কিছু ক্ষেত্র ছিল, যেখানে অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে পাকিস্তানের রাজনীতির বাস্তবতা ও বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মেলবন্ধন ঘটাতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সহযোগী তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন রাজনৈতিকভাবে খুবই বুদ্ধিদীপ্ত ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রখর। তাঁদের সঙ্গে বসে আমরা প্রকৃত অর্থে বুঝতে পারি রাজনৈতিক-অর্থনীতি বাস্তবে আসলে কী জিনিস। ১৯৬৯ সালে আমি, কামাল হোসেন ও হামিদা হোসেনের সহযোগিতায় ফোরাম নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশনার কাজ শুরু করি। আমার এই রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও ফোরাম-এ লেখালেখির বিষয়টা পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই নিয়েছিল। বাঙালিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা শুরু করার দুই দিনের মাথায় ২৭ মার্চ আমাকে ধরতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল আমার বাসায় আসে। সৌভাগ্যক্রমে আমি বাসা থেকে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলাম, তাই তাদের উদ্দেশ্য সফল হতে পারেনি। ২৭ মার্চের পর থেকে ১৯৭১ সালের পুরো সময় আমি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণাকাজে মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে কাজ করেছি। আমার প্রধান কাজই ছিল পাকিস্তানি সরকারের বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ বন্ধ করার জন্য বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনসমর্থন আদায় করা। এ কাজ অনেকটাই সফল হয়।

দেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীন বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণই আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এ নিয়ে আমার বহু গবেষণায় আমি দারিদ্র্যের কাঠামোগত দিকটিতে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি, যে বিষয়টি তেমন একটা আলোচিত হয় না। দারিদ্র্য ও ন্যায়বিচারের মধ্যে সূত্র খুঁজতে গিয়ে দারিদ্র্যের চিরস্থায়িত্ব ও গরিবের রাজনৈতিক

ক্ষমতাহীনতার পেছনে কাঠামোগত অবিচারের ভূমিকা সম্পর্কে আমি সচেতন হয়ে উঠি এবং গবেষণা ও লেখালেখি শুরু করি।

এ বিষয়টিতে আমি বেশ কয়েকবার আলোকপাত করেছি। 'দুই অর্থনীতি থেকে দুই সমাজ' শীর্ষক নাজমুল করিম স্মৃতিবক্তৃতা, 'ব্যাংকিং খাতে ন্যায়বিচার' শীর্ষক নুরুল মতিন বক্তৃতা ও 'উন্নয়নে ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠা' শীর্ষক মাহবুবুল হক স্মৃতিবক্তৃতায় আমি আমাদের দারিদ্র্যবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তনের আনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছি। এটাকে সম্পদের অপ্রতুলতার ফল হিসেবে না দেখে কাঠামোগত অবিচারের ফলাফল হিসেবে বিবেচনা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছি। রোমে ২০০১ সালের জুলাইয়ে এফএও-র 'ইর‍্যাডিক্যাটিং রুরাল পোভার্টি: মুভিং ফ্রম এ মাইক্রো টু ম্যাক্রো পলিসি এজেন্ডা' শীর্ষক বক্তৃতায় আমি এই অবিচারের থিসিস আরও সংহত করে দারিদ্র্য দূরীকরণের কৌশল নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছি। এর উপায় হিসেবে বলেছি, কাঠমোগত অবিচারের বিষয়টি সংশোধন করে অর্থনৈতিক সুযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গণতন্ত্রায়ণ ঘটাতে হবে।

আমার নেতৃত্বে চার বছরব্যাপী সিপিডি-সাসেপস্ একটি গবেষণা প্রকল্প শুরু করে। এর ফলাফল আমার *চ্যালেঞ্জিং দ্য ইনজাস্টিস অব পোভার্টি: এজেন্ডাস ফর ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া* বইয়ে প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে আমি সম্পদের মালিকানায় ও বাজারের পরিচালনায় গণতন্ত্রায়ণের মাধ্যমে অবিচারের ব্যবস্থায় সংশোধন আনার কথা বলেছি। এতে দক্ষিণ এশিয়ার সুশীল সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নীতি প্রণয়ন ও কাঠামোগত হস্তক্ষেপের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিচের বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে:

১. উৎপাদনশীল সম্পদের ওপর দরিদ্রদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের প্রসার
২. জ্ঞানভিত্তিক সমাজে দরিদ্রদেরও অংশগ্রহণ বাড়ানো
৩. দরিদ্রদের বাজার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সক্ষমতা বাড়ানো
৪. সরকারি সম্পদ দরিদ্রদের কাছে পৌঁছানোর জন্য বাজেটীয় নীতি সংস্কার
৫. দরিদ্ররা যাতে সামষ্টিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে সম্পদের মালিকানা লাভ করতে পারে, সে লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ; দরিদ্রদের জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যম সৃষ্টি

অবিচারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে আমরা যে কাজটি শুরু করেছি, সেটা কেবল একটি একাডেমিক তৎপরতা নয়। এর লক্ষ্য হলো, সরকারি নীতি ও সুশীল সমাজের

সংগঠকদের তৎপরতায় প্রভাব বিস্তার করা। আমি আশা করি, তরুণ প্রজন্ম এই অবিচার বন্ধের আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

প্রথম আলো
৭ নভেম্বর ২০১৪

আরেক অনিশ্চয়তার দিকে যাচ্ছি

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অর্থনীতির দিক থেকে বর্তমান সরকারের প্রথম দুই বছর বেশ ভালো ছিল। তৃতীয় বছরের দ্বিতীয় অংশ থেকে, অর্থাৎ ২০১২ সালের জানুয়ারির পর থেকে অর্থনীতিতে প্রথম দিকের যে ইতিবাচক ত্বরণটি ছিল, আস্তে আস্তে তা প্রশমিত হতে শুরু করে। ২০১২ সালের শেষ এবং ২০১৩ সালের শুরুর দিকে দেশ আবার প্রাক-নির্বাচনী সংকটের ভেতরে চলে যায়। এর প্রভাবে ২০১২ সালের শেষ ভাগ থেকে শুরু হয়ে ২০১৩ সাল জুড়ে যে সমস্যাটি সবচেয়ে ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান হয়েছে, তা হলো বিনিয়োগের পতন, বিশেষত ব্যক্তি খাতে। বিনিয়োগের পতনের প্রকাশ ঘটে প্রবৃদ্ধির দুর্বলতার মধ্য দিয়ে। আমরা দেখতে পাই, গত কয়েক বছর ধরে প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ দেশজ আয়ের শতকরা হিসাবে কমে এসেছিল, যে ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। বছর জুড়ে মুদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ব্যক্তি খাতে ঋণপ্রবাহ কম ছিল। ব্যক্তি খাতে আমদানিও কম হয়েছে, বিশেষ করে পুঁজিপণ্য। এর ফলেও শিল্পঋণ কিছুটা নিম্নমুখী ছিল। ঠিক মতো ঋণ না পাওয়ায় এবং ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে যথাযথ নির্বাচনের অভাবে তফসিলকৃত মন্দঋণের শতকরা হার বেড়েছে। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি মৌলিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

মনে করা হয়েছিল, অবকাঠামো, সেবার উন্নতি হলে হয়তো বিদ্যুৎ, গ্যাস, নিষ্কণ্টক জমি এ খাতগুলোর উন্নতি হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সামান্য কিছু উন্নতি হলেও বিদ্যুৎ বা গ্যাসের নতুন সংযোগ, শিল্প-কারখানার জন্য জমি পাওয়ার মতো সমস্যাগুলোর সমাধানে কোনো অগ্রগতি হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্প সম্পর্কের ওপর নতুন চাপ। বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা এবং বেঁচে থাকার মতো মজুরি পাওয়াকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ। রপ্তানিতে

জিএসপি সুবিধা বাতিল হওয়ার কারণে এ অর্থবছরে বিনিয়োগ পরিবেশকে আরও জটিল করেছে। বিজিএমইএ-র পক্ষ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারের জন্য যে জিএসপি সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়, তার পরিমাণ এর মধ্যেই কমে এসেছে। একই সঙ্গে এ শিল্পে শ্রমপরিবেশ উন্নত করার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক নজরদারি বৃদ্ধি পাওয়া বিনিয়োগের পরিবেশকে আরও জটিল করে তুলেছে।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নিঃসন্দেহে বেড়েছে। সরকারের মেয়াদকালের প্রথম দিকে এ মজুদ বাড়ার কারণ ছিল, রপ্তানি ও প্রবাসী আয়প্রবাহ ভালো ছিল, বৈদেশিক সাহায্যও অনেক এসেছে। কিন্তু এখন আমরা দেখছি, বৈদেশিক বিনিয়োগ একই জায়গায় আছে, প্রবাসী আয়প্রবাহে ভাটা পড়ছে, বৈদেশিক সাহায্য কমে যাচ্ছে। বৈদেশিক আয়ও যে খুব স্বস্তির মধ্যে আছে, তা নয়। বর্তমান অর্থবছরে রাজনৈতিক সহিংসতা এবং নির্বাচনী অনিশ্চয়তা বিনিয়োগ পরিবেশকে আরও জটিল করে তুলেছে।

এখন বারবার যে প্রশ্নটা উঠছে সেটা হলো, বাংলাদেশ কি আমদানির জন্য আদৌ নির্ভরযোগ্য উৎস কিনা; বিনিয়োগের জন্য নিরাপদ জায়গা কিনা। মাঝে এ প্রশ্নগুলো কেটে গিয়েছিল। কিছুদিন আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়ে সকল অঙ্গনে আলাপ চলছিল। এখন আবার হঠাৎ করে বাংলাদেশে ঝুঁকির বিষয়গুলো আলোচনায় উঠে আসছে। ২০১৩ সালে আমরা সম্ভাবনার দেশ থেকে ঝুঁকির দেশে চলে গেলাম কিনা; বা ঝুঁকির দেশে আমরা স্থায়ী বসবাস করব কিনা – ২০১৪ সালে আমাদের অগ্রযাত্রার গতিচিত্র থেকে নির্ধারিত হবে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর।

২০১৩ সালে যে বিষয়গুলো অর্থনীতির বড় ধরনের ক্ষতি করছে, সেগুলো ২০১৪ সালে কত মাস অব্যাহত থাকবে, তার ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করছে। কারণ এ থেকেই নির্ধারিত হবে, বাংলাদেশের অর্থনীতি কত দ্রুত আবার প্রবৃদ্ধির উচ্চ মাত্রার দিকে ধাবিত হতে পারবে। এ অর্থবছরে বিনিয়োগের জায়গা বাদ দিলে তুলনামূলকভাবে কৃষি খাতের অবস্থা ভালো ছিল। বোরো কিছুটা নরম ছিল; কিন্তু আমন ধানের ফলন ভালো হয়েছে। এক্ষেত্রে বারবারই ঘুরে-ফিরে যে প্রশ্নটা আসছে সেটা হলো, কৃষক ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে কিনা; কৃষি, বিশেষ করে ধান চাষ লাভজনক থাকবে কিনা। বর্তমানে কৃষি জমি অ-কৃষি খাতে নিয়োজনের ক্রমবর্ধমান যে ধারা দেখা যাচ্ছে তার ফলে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার ভবিষ্যতও কৃষি খাতের আলোচনাতে নতুনভাবে উঠে আসছে।

আমরা এ সময়কালে রপ্তানিকে একটা উজ্জ্বল জায়গায় দেখেছি। কিন্তু রপ্তানি আবার বিভিন্ন প্রশ্ন ও হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এখন ২৫ শতাংশ রপ্তানির যে পরিমাণ দেখানো হয়েছে, সেটা গত বছরের নেতিবাচক রপ্তানির ওপর হিসাব করা হয়েছে।

আবার প্রবাসী আয়প্রবাহ বছরের শুরুর দিকে যতটা উচ্চ ছিল, বছরের শেষে এসে তার পতন ঘটেছে। কারণ, গত অর্থবছরের চেয়ে মানুষের বিদেশে যাওয়ার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাই গত কয়েক বছর বৈদেশিক হিসাবে ভারসাম্য আনতে প্রবাসী আয় যেভাবে সমর্থন দিয়েছে, তা বজায় থাকবে কিনা তা নিয়ে দুশ্চিন্তা দেখা দিচ্ছে।

মূল্যস্ফীতি মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে এসেছিল; কিন্তু বছরের শেষে এসে এটা আবার বাড়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। যদিও এখনও মূল্যস্ফীতি মুদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে উপরে (৮-এর ওপরে, ৯-এর কাছাকাছি) রয়েছে। অবরোধ ও হরতালের কারণে সরবরাহ ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

এ অর্থবছরে সরকার কর আদায়ও খারাপ করেনি। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, আদায়ের হার আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। আগের বছরগুলোর তুলনায় আদায় বৃদ্ধির হার কমে গেছে।

অর্থবছরের অর্ধেক আমরা পার হয়ে এসেছি। গত অর্থবছরের প্রথম ভাগে বৈদেশিক সাহায্য ভালো এসেছে। বৈদেশিক প্রকল্প সাহায্য ভালো আসাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বিনিয়োগের পরিবেশও অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভালো হয়েছে। এডিপি বাস্তবায়নের হারও ভালো ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে এসে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় বৈদেশিক সাহায্যের পতন ঘটেছে। যার ফলে বার্ষিক এডিপিও নতুন বছরের প্রথম ভাগে যত ভালো ছিল শেষে এসে একটু দুর্বল হয়ে গেছে।

রাজস্ব ব্যয় বেড়েছে। এখন উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের বর্ধিত ব্যয়ের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, যাদের জন্য এ ব্যয় করা প্রকৃতই তাদের কাছে এর উপকার পৌঁছল কিনা। যে পরিমাণ টাকায় এ প্রকল্পগুলো করা হচ্ছে, তার প্রকৃত সুবিধাও সে পরিমাণ কিনা। ফলে এবার পরিমাণের থেকে গুণগত মানের প্রশ্নটা অনেক বড় হয়ে উঠছে।

বিগত অর্থবছরে রিজার্ভ বাড়ার একটা প্রধান কারণ ছিল, প্রবাসী আয়ের উচ্চপ্রবাহ এবং পাশাপাশি আমদানি ব্যয় কম থাকা। আগামী দিনে যদি বৈদেশিক আয়ে কোনো রকম ধাক্কা আসে, তাহলে টাকার মূল্যমানের বড় ধরনের পতন ঘটবে। তখন সে ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদকে ব্যবহার করার একটা সুযোগ আসবে। এটা একটা ইতিবাচক দিক যে, নীতি-প্রণেতারা টাকাকে ঠেকা দেওয়ার সুযোগটা পাবেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঝুঁকিগ্রস্ত দেশে পরিণত হওয়ার পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ কী? উত্তরণের পথ একটাই, অর্থনীতিকে রাজনৈতিক উত্তাপ থেকে দূরে রাখা। কিন্তু সেটার ব্যাপারে রাজনৈতিক উদ্যোগ বা ব্যবসায়ীদের চেষ্টা কোনোটাই সফল হয়নি এখন পর্যন্ত। বরং এখন যে অবস্থা চলছে সেটা হলো, অর্থনীতিকে পঙ্গু করার মাধ্যমে সরকারকে বিকল করা। যেহেতু শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জায়গাটা সংকুচিত হয়ে গেছে এবং এর সঙ্গে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারসহ অন্যান্য বিষয় যুক্ত হয়ে আরও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু শেষে যেটা দাঁড়িয়েছে, অর্থনীতিকে বিকল করার মাধ্যমে রাজনীতিকে নতজানু করার চেষ্টা চলছে। আমরা আত্মঘাতী রাজনীতির ভেতরে ঢুকে গেছি। এই আত্মঘাতটা একটা রাজনৈতিক দল বা সরকারের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তা কিন্তু নয়। কারণ, আমার হিসাবে দেশ যদি একটি মধ্যবর্তী সংকটে ঢুকে যায়, তাহলে সেখান থেকে বের হয়ে অর্থনীতিকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে চার-পাঁচ বছরের বেশি সময় লেগে যাবে। যারা এখন অর্থনীতিকে অচল করার চিন্তা করছে, তারাই কিন্তু সরকারে যেতে চায়। যদি তারা ক্ষমতায় আসে, তারা একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতির ভেতর ক্ষমতায় আসবে। এই রাজনীতিতে কারোরই জয় নেই। এ রাজনীতিতে অর্থনীতি, দেশ – সবারই ক্ষতি। কারণ, ২০১৩ সালে অর্থনীতিতে যে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো ২০১৪ সালেও অব্যাহত থাকবে। আমি এখনও কোনো উত্তরণের পথ দেখছি না।

৫ জানুয়ারির পর যে সরকার আসবে তাদের ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, এ সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা হয়তো থাকবে, সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা হয়তো থাকবে; কিন্তু এর রাজনৈতিক বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা হবে খুবই সংকুচিত আর নৈতিক বৈধতা হবে খুবই সংকীর্ণ। এ রকম একটি রাজনৈতিক, নৈতিক বৈধতার স্বল্পতায় আক্রান্ত সরকার যে খুব কর্মক্ষম সরকার হতে পারবে, তা কিন্তু আমার মনে হয় না। তারা জোর দিয়ে কোনো অর্থনৈতিক সংস্কার করতে পারবে না; কর আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের নমনীয় হতে হবে; বৈদেশিক সাহায্য, দেশীয় সম্পদ বা রপ্তানির সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা অনেক বেশি বাধার মুখোমুখি হবে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করার ক্ষেত্রে, প্রকল্প কার্যকারিতার ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রশাসন কতখানি আগ্রহ নিয়ে কাজ করবে সেটাও খুব নিশ্চিত নয়। আর যদি দেশের ভেতরে রাজনৈতিক অস্থিরতা অব্যাহতই থাকে এ সরকার গঠনের পর, তাহলে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে আসবে না। তারা অপেক্ষা করে থাকবে আবার কে মন্ত্রী হয় দেখি। সবাই ধরে নিয়েছে, যে সরকার ক্ষমতায় আসবে সে পূর্ণমেয়াদে আসবে না। যারা খুব বেশি আশাবাদী তারাও তিন বছরের বেশি বলতে সাহস করে না। যে সরকার পূর্ণ মেয়াদে থাকবে না, সে সরকার অর্থনীতিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাবে, নতুন পথ দেখাবে আমি তো তা দেখি না।

আলোকিত বাংলাদেশ
১ জানুয়ারি ২০১৪

কার্যকর গণতন্ত্রচর্চায় আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে উদাসীনতা লক্ষণীয়

রওনক জাহান

বণিক বার্তা: আপনার দৃষ্টিতে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে গণতন্ত্রের চর্চা কোন স্তরে রয়েছে?

রওনক জাহান: আশির দশকের পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্বাচনী গণতন্ত্র অর্থাৎ ইলেক্টোরাল ডেমোক্রেসি চালু হয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণের নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর পূর্ব ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়ার অনেক দেশ নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যায়। এসব দেশেও গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হয়। এখন পৃথিবীর সব দেশেই জনগণ নির্ধারণ করছে, কারা ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু আমরা যদি উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপকে গণতন্ত্রের মডেল হিসেবে রাখি তাহলে এসব উন্নয়নশীল দেশে দেখি গণতন্ত্র নামসর্বস্ব এবং শুধু নির্বাচনকেন্দ্রিক। গণতন্ত্রের গুণগত মান এসব দেশগুলোতে সেভাবে পরিলক্ষিত হয় না। নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও নতুন গণতন্ত্রচর্চাকারী দেশগুলোতে সংঘাত সৃষ্টি হয়। বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো যখন জরিপ করে তখন দেখা যায়, বেশিরভাগ দেশেই নামসর্বস্ব গণতন্ত্র বিরাজ করছে। গণতন্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়ামককে মানদণ্ড হিসেবে দেখা হয়, যেমন – সেখানে নিয়মিত নির্বাচন হচ্ছে কিনা, আইনের শাসন আছে কিনা এবং সবার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে কিনা প্রভৃতি। পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলো সবসময় এই বিষয়গুলোতে এগিয়ে থাকে। এসব দেশে সরকার সংসদ ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সব সময় ভারসাম্য নিশ্চিত করা হয়। এদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দেখা যায়,

গণতন্ত্রচর্চার সূচকে একটা-দুইটা বিষয়ে উন্নতি হয়েছে। কোথাও নির্বাচন হচ্ছে; আবার কোথাও নির্বাচন নিয়ে সমস্যা রয়েছে। কিন্তু ষাট কিংবা সত্তরের দশকে যে সেনা শাসন এই অঞ্চল, এমনকি ল্যাটিন আমেরিকাতেও ছিল, তা কিন্তু এখন আর নেই। এখন রাজনীতিবিদরা নির্বাচিত হয়ে দেশ শাসন করছে এবং সেনাবাহিনী তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি অগ্রগতি। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে বর্তমানে যে বিষয়টি এগোচ্ছে না তা হলো, সরকার, সংসদ এবং বিচার ব্যবস্থার মধে ভারসাম্য বজায় থাকছে না। এখানে দেখা যাচ্ছে, সর্বময় ক্ষমতা থাকছে সরকার প্রধানের হাতে। সেক্ষেত্রে আইনের শাসন ব্যাহত হচ্ছে বৈকি। রাষ্ট্রের কোনো কাঠামোর মধ্যেই জবাবদিহি নেই। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের দূরাবস্থা দেখে এখন হয়তো ভাবছি, আমরা বিশেষ কিছু করতে পারছি না। কিন্তু আমরা যদি অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখতে পাব, তাদের গণতন্ত্রও আমাদের মতো নানা সমস্যার মুখোমুখি। উদাহরণস্বরূপ আফ্রিকার দেশগুলোতে নির্বাচন হচ্ছে; কিন্তু সেখানে প্রচুর দুর্নীতিও হচ্ছে। আবার মালায়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে বিরোধী জোটকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বিশিষ্ট লেখক ফরিদ জাকারিয়া এসব দেশকে অনুদার গণতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করেছেন। আমাদের অনেকের মনে হতে পারে, গণতন্ত্রচর্চার শুরুতেই আমরা হয়তো উত্তর আমেরিকা কিংবা পশ্চিম ইউরোপের মতো গণতন্ত্র পাব – কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। আমাদের দেশে গণতন্ত্র তো একেবারেই শিশু বলা যায়। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বেশিরভাগ সময়ই আমাদেরকে সেনা-সমর্থিত সরকারের অধীনে থাকতে হয়েছে। ১৯৯০ সালে জনগণের আন্দোলনের ফলে সেনা শাসনের অবসান এবং একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর আবার ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের আগে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে নতুন একটি সমস্যা তৈরি হয়। সেখান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উৎপত্তি। ২০০১ সালে ঠিকভাবে নির্বাচন হলেও ২০০৬ সালে আবার একটা সমস্যা তৈরি হয়। এটি হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে অপপ্রয়োগের কারণে। এর ফলে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগমন। তাদের অধীনে ২০০৮ সালে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়। এরপর নির্বাচন নিয়ে আবারও সমস্যা তৈরি হয়। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি যে নির্বাচন হলো, সেটারও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

তবে মনে রাখতে হবে, নির্বাচন হলো গণতন্ত্রচর্চার নিয়ামকগুলোর মধ্যে অন্যতম, কিন্তু প্রধান নয়। সেখানে আমাদের দেশে বিশেষত ১৯৯০ সালের পর কিছু বাধা-বিপত্তি ছাড়া নিয়মিত নির্বাচন হলেও গণতন্ত্রের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন – কার্যকর জাতীয় সংসদ, সংসদে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আমাদের দেশের বিরোধী দলের নেতারা মনে করেন, রাস্তায় আন্দোলন করলেই বোধহয় গণতন্ত্র আসবে। এমন ধারণা ঠিক নয়। তবে আমাদের দেশে গণতন্ত্রের অন্যতম একটি নিয়ামক

জনগণের কণ্ঠস্বর যেখানে গণমাধ্যম একটি ভূমিকা রাখে তা অনেক শক্তিশালী হয়েছে। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে সরকার এখনো পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এটি অবশ্যই একটি ভালো দিক। গণমাধ্যমগুলো বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অন্যতম সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। আমরা গণতন্ত্রের চর্চা করছি, সেটি সন্তোষজনক না হলেও ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের পূর্ণ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করি।

বণিক বার্তা: দুই দশকে যতটুকু পথ অতিক্রম করেছি, সেটিকে কি আপনি সন্তোষজনক বলবেন?

রওনক জাহান: মোটেই সন্তোষজনক নয়। ২০০৬ সালে বিএনপি নেতৃতাধীন চারদলীয় জোট যখন নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করল তখনকার বিরোধী দল আওয়ামী লীগ তা মেনে নেয়নি। আন্দোলন সহিংসতায় রূপ নিলে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসে। দীর্ঘ দুই বছর এক ধরনের অবৈধভাবে দেশ শাসন করেছে। সে সময়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা মোকাবেলা করতে হয়েছে। বড় দুই রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর ২০০৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসলে সবাই ভেবেছিল সরকারি দল ও বিরোধী দল এক সঙ্গে মিলে একটি ব্যবস্থা উদ্ভাবন করবে যাতে নির্বাচন নিয়ে ভবিষ্যতে আর গোলযোগ না হয়। ২০১১ সালে বর্তমান সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তা মেনে নেয়নি। তারা বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে নির্বাচন অংশ নেবে না বলে জানিয়ে দেয় এবং সেটিই করে। বিএনপি আন্দোলনে নামে। মাঝে জামায়াত তাণ্ডবও চালায়। এভাবে নির্বাচন নিয়ে বিশেষ যে অবস্থান ছিল আমাদের, সেটিও নষ্ট হয়ে গেল। কারণ ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনটি গ্রহণযোগ্য হয়নি। সেক্ষেত্রে কার্যকর গণতন্ত্রচর্চায় আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো ব্যর্থ হয়েছে।

বণিক বার্তা: গণতন্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের মধ্যে সদিচ্ছার অভাব দেখা যাচ্ছে কি?

রওনক জাহান: কার্যকর গণতন্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে উদাসীনতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কোনো দলই আর পরাজিত চাচ্ছে না। দুটি দল থাকলে গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনে একদল বিজয়ী এবং একদল বিজিত হবেই। বাংলাদেশেও সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। ক্ষমতা একটি ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়ায় চলবে।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছেও ক্ষমতা সেভাবেই এসেছে। একবার বিএনপি, পরের বার আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনা করেছে। সেক্ষেত্রে এখন কেন তারা আর পরাজিত চাইছে না, সে বিষয়টিও আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে।

গণতন্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে আইনের শাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশে যারাই ক্ষমতায় যাচ্ছে তারাই আইনকে নিজেদের মতো করে নিচ্ছে এবং সেভাবেই সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বিরোধী দলের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে। সরকারে আসলেই ক্ষমতাসীনরা নিজেদের সব মামলা তুলে নিচ্ছে আর বিরোধী দলের ওপর নিত্যনতুন মামলা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, জেল-জুলুম চলছে। ফলে কোনো রাজনৈতিক দলই আর পরাজিত হতে চাইছে না। কারণ ক্ষমতায় থাকলে অত্যাচার সহ্য করতে হবে না।

নির্বাচনের আগে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির কথা বলা হচ্ছে; কিন্তু নির্বাচনের পরেও তো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের দরকার। ভারতে নির্বাচনে কেউ হেরে গেলে বলছে না, আমি নির্বাচন মানি না। তারা যদি এই সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে, তবে আমরা কেন পারব না। বিরোধী দলকে ছায়া সরকার বলা হলেও আমাদের দেশে বিরোধী জোটে থাকা মানে অপরাধী হয়ে যাওয়া। ফলে তারা কীভাবে কাজ করবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

বণিক বার্তা: গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিবেশী দেশ কতটা ভূমিকা রাখে?

রওনক জাহান: রাজনীতিতে একটা কথা আছে, ‘পলিটিক্স ইজ লোকাল’ অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরেই রাজনীতিবিদরা রাজনীতি করে, যার একটি নিজস্বতা আছে। এখানে প্রতিবেশী বা বিশ্বের অন্যান্য দেশ কেবল গণতন্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড তৈরির রূপরেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে পশ্চিমাদের একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড আছে। সে অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো প্রতিবেদন তৈরি করলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রচর্চা খারাপ হিসেবেই স্থান পাবে। গবেষণা প্রতিবেদনগুলোও তাই বলছে। মালয়েশিয়া কিংবা সিঙ্গাপুর কিন্তু পশ্চিমাদের মতামত তেমন একটি গ্রাহ্য করে না। না করার অন্যতম কারণ তাদের অর্থনীতি অনেক শক্তিশালী। আমাদের অর্থনীতি এখন রেমিট্যান্স, গার্মেন্টসহ কিছু খাতের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। পশ্চিমাদের প্রভাব আমাদের ওপর তেমন একটা নেই ঠিক যেমনটা ছিল সত্তর কিংবা আশির দশকে। আমরা এখন সহায়তা-নির্ভর নই, ফলে পশ্চিমাদের কথা না শুনলে তারা তেমন কিছুই করতে পারবে না। তবে এও সত্য, বিশ্বায়নের এ যুগে সবার মত উপেক্ষা করেও আমরা চলতে পারব না।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধিকার আন্দোলনের সময় আমাদের সামনে গণতন্ত্রের দুটো মডেল ছিল। একটি পাকিস্তান, অন্যটি ভারত। পাকিস্তান ধর্মীয় রাজনীতি করছিল এবং সেখানে কার্যকর গণতন্ত্র ছিল না। অন্যদিকে ভারত সেক্যুলার রাজনীতি এবং গণতন্ত্রের চর্চা করছিল। তখন বিষয়টা সহজ ছিল এবং আমরা ভারতকেই আমাদের গণতন্ত্রচর্চার মডেল হিসেবে পছন্দ করেছিলাম। বর্তমানে আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতের পক্ষ ও বিপক্ষ কিংবা পাকিস্তানের পক্ষ ও বিপক্ষ হয়ে যাওয়াতে বিষয়টি আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। পাকিস্তান ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করছে বলে সেখানে জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছে। তাদের অর্থনীতির অবস্থা আমাদের থেকেও খারাপ। অন্যদিকে আমাদের প্রতি ভারতের আচারণ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ভারত একটি বড় দেশ বলে তাদের প্রভাব আমাদের ওপর থাকবেই – এমনটি ভেবে নেওয়াও দুর্বলতা। আমাদের রাজনীতিতে ভারত একটি বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন সময়ে বিএনপি যখন ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসল, আমরা ভাবলাম এবার হয়তো বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে 'ভারত' বিষয়টা উঠে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। মূল কথা হলো, আমাদের রাজনীতি আমাদের মত করেই চলবে এবং তাকে সেভাবেই চলতে দেওয়া উচিত।

বণিক বার্তা: আমাদের গণতন্ত্রচর্চায় কোথায় কোথায় সংস্কার প্রয়োজন? অনেকে আমাদের গণতন্ত্রের মডেল নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন। আপনি বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন?

রওনক জাহান: আমাদের দেশের যেকোনো লোককে জিজ্ঞেস করলেই বলবে, তারা দুর্নীতি চায় না। ফলে দুর্নীতি রোধ করতে না পারাটা রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতা। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের চর্চা বাড়াতে হবে। তাদের আইনের শাসনের প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পেরেছে। কিছু কিছু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করেছে। তাদের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখানে গণতন্ত্রের চর্চা বার বার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। রাজনৈতিক মতবাদে ভিন্নতা থাকবেই; কিন্তু সমস্যা রাজনৈতিক দলগুলোকেই সমাধান করতে হবে। আমরা বর্তমানে কিছুটা আফ্রিকার দেশগুলোর মতো আচরণ করছি, যেখানে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। আমরা যদি রুয়াণ্ডার হুটু এবং টুটসিদের মতো বিভাজন সৃষ্টি করে চলি তাহলে আমাদের গণতন্ত্রের পথ সুগম হবে না।

বণিক বার্তা: পরিবারতন্ত্র কি গণতন্ত্রের জন্য অন্তরায়?

রওনক জাহান: আবার ভারতের দিকেই তাকানো যাক। সেখানেও পরিবারতন্ত্রই চলে আসছে। কংগ্রেস এখন পর্যন্ত পরিবারতন্ত্রই চর্চা করছে। কিন্তু সেখানে পরিবারতন্ত্র নেতৃত্বের একটি দিক মাত্র। নেহেরু যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তার সমকক্ষ আরও অনেকেই ছিলেন। নানা বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে এবং তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নেতা গণতান্ত্রিক মনমানসিকতাসম্পন্ন হলে গণতন্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে পরিবারতন্ত্র তেমন কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

এরপর যে বিষয়টি বলা দরকার তা হলো নেতৃত্বের গুণাবলী ও সঠিক নেতৃত্ব। এক্ষেত্রে ভারতের একটি ঘটনা বলা দরকার। নেহেরুরই শাসনামলে স্পিকার নেহেরুকে চিঠি দিলেন, তিনি তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে চান। এ জন্য তিনি আসতে চান। নেহেরু বললেন আপনি স্পিকার হয়ে আমার কাছে আসবেন – তাতে স্পিকারের পদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। বরং আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আপনার কাছে আসছি। এখানে নেহেরু একটি মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যে প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারের মধ্যে কী রকম সম্পর্ক থাকা দরকার। স্পিকার যাতে প্রধানমন্ত্রীর অজ্ঞাবহ তা যেন মনে না হয়। কিন্তু আমাদের দেশে কি সেরকম নেতৃত্ব আছে? অবশ্যই নেই। সেক্ষেত্রে সঠিক নেতৃত্ব না থাকাটাই আমাদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় একটি বড় অন্তরায়।

বণিক বার্তা: বর্তমান অবস্থায় সরকার ও বিরোধী পক্ষের প্রতি আপনার পরামর্শ কী থাকবে?

রওনক জাহান: বর্তমান সরকারের প্রতি আমার পরামর্শ থাকবে, ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে দিন বদলের সনদে যে প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিল সেটি রক্ষায় তাদের কাজ করতে হবে। দলের ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চা করবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। বিরোধী দলকে নিপীড়নের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে।

বিরোধী দলের প্রতিও একই পরামর্শ থাকবে, তারা যেন দলের ভেতর গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি করে। ছায়া সরকারের মতো কাজ করতে হবে তাদের। রাস্তার সহিংস আন্দোলন বন্ধ করতে হবে। কার্যকর গণতন্ত্রচর্চার মাধ্যমে তারা যদি নিজেদেরকে প্রমাণ করতে পারে, সেক্ষেত্রে তাদের সুযোগ বাড়বে বৈ কমবে না।

আর জনগণ নিশ্চয়ই সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষের জবাবদিহি প্রতিনিয়তই চাইবে। জনগণের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গণমাধ্যমকে পালন করতে হবে।

বণিক বার্তা
৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

সাক্ষাৎকার: এম এম মুসা
অনুলিখন: মুহাম্মাদ হাসান রাহফি

গণতন্ত্রকে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে

রেহমান সোবহান

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক যে অর্জন, তা আজ হুমকির মুখে। সামাজিক নিরাপত্তাও ভেঙে পড়ছে দ্রুতগতিতে। পুনরুদ্ধারকৃত গণতন্ত্র আজ ভূলুণ্ঠিত। বাংলাদেশ হাঁটছে গণতান্ত্রিক ধারার সেই পেছন দিকে, ঠিক যে পথ দিয়ে এগিয়েছিল। কিন্তু এই যে গণতন্ত্রকে পেছনে ঠেলে দেওয়া, এর দায় কার? কে আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ক্ষয়রোগগ্রস্ত করেছে? সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান বিষয়টি তুলে ধরেছেন গতকাল ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকায় 'পুটিং ডেমোক্রেটিক প্রসেস ব্যাক অন ট্র্যাক নিবন্ধে'। এর উল্লেখযোগ্য অংশে রেহমান সোবহান বলেন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় সূচকে এক সঙ্গে উন্নতি এবং অন্য প্রত্যাশার জায়গাগুলোতে বেশ ভালো কিছু করে দেখিয়েছে বাংলাদেশ। বিগত ২০ বছরে দেশটি উপভোগ করেছে চারটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার করে দেশে ফিরিয়ে এনেছে আইনের শাসন। শেখ হাসিনার সরকার একাত্তরের ঘাতকদের বিচারে গঠন করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইতিবাচক অগ্রগতির ফসল ঘরে তোলা যায়নি শুধু নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান কে হবেন এ নিয়ে দেশের প্রধান দুই জোট বিভক্ত হয়ে পড়ায়। এর ফলস্বরূপ বিএনপির শরিক জামায়াতে ইসলামী দ্বারা দেশ শিকার হয়েছে হিংসাত্মক কার্যক্রম আর তাণ্ডবের। সংকট জিইয়ে রেখেই অনুষ্ঠিত হয় দশম জাতীয় নির্বাচন, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ফেলেছে ঝুঁকির মধ্যে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষয় সাধন করেছে গণতান্ত্রিক উত্তরাধিকারের। এ বিষয়ে তর্ক-পাল্টা তর্ক হতে পারে অনেক; যে কে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশাকে ক্ষয়রোগগ্রস্ত করার জন্য দায়ী? কে আমাদের ঠেলে দিয়েছে একতরফা নির্বাচনের দিকে, যা কিনা আমাদের নিপতিত করেছে অনিশ্চিত গন্তব্যে? বর্তমান অবস্থানে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি, এই

যে ৫ জানুয়ারি নির্বাচন হয়ে গেল, এর মাধ্যমে দেশে বিরাজ করছে চাপা উত্তেজনা। বাংলাদেশ হারিয়েছে সামনের দিকে চলার ইতিবাচক গতি আর অনুমেয় ভবিষ্যৎ।

সদ্য সমাপ্ত নির্বাচন খর্ব করেছে রাষ্ট্রব্যবস্থার গণতান্ত্রিক চরিত্র। এখানে এসে আমরা আবারও তর্কে জড়াতে পারি যে কে এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী। কিন্তু ভালো করে তাকালে বলা যায়, দশম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ইতিহাসে সর্বনিম্ন ভোটার উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। ৩০০ সদস্যের মধ্যে নির্বাচিত ঘোষিত ১৫৩ জন, যারা ৫৩ শতাংশ ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করেন, একটি ভোটও পড়েনি তাদের পক্ষে। এমনকি আমরা যদি নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত পরিসংখ্যান দেখি, যেখানে তারা ১৪৭ জন সদস্যের পক্ষে ৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে দাবি করেছে, সেখানে অনুমান করা যায়, চূড়ান্তভাবে ভোটারের উপস্থিতি হয়েছে ১৮ শতাংশ। এমনকি ১২ জানুয়ারি নতুন সরকারের শপথ নেওয়া মন্ত্রীদের একটি বড় অংশই নির্বাচিত হয়েছেন কোনো রকম ভোট ছাড়া।

রেহমান সোবহান বিএনপির সমালোচনা করে বলেন, দলটি রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে নিজেদের মূল্যায়ন ও এর ফল কী হতে পারে তা নির্ণয় করতে। যে অথর্ব একটি নির্বাচন হয়ে গেল, এর দায়ভার অবশ্যই দলটিকে নিতে হবে। অনেক বছর ধরেই বিএনপির গণতান্ত্রিক ভিত্তি ক্ষীয়মাণ। তাই তারা ব্যর্থ হয়েছে আমজনতাকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে। আর এতে বিএনপি হয়ে পড়েছে জোটশরিক জামায়াত-নির্ভর, যারা সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতা ছড়িয়েছে রাজপথে, অলিতে-গলিতে। জামায়াতের গায়ে রয়েছে যুদ্ধাপরাধের তকমা আঁটা। তাদের অনেক নেতাই ট্রাইব্যুনালে বিচারের মুখোমুখি। এমন একটি দলকে জোটভুক্ত করে মাঠে নামায় বিএনপি কতটা জনসমর্থন হারিয়েছে, তা নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়েছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতির দায় থেকে কোনোভাবেই মুক্তি মিলছে না বিএনপির।

সবশেষে রেহমান সোবহান উল্লেখ করেছেন, এ অবস্থায় কী করা যেতে পারে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে। তার মতে, যত শিগগির সম্ভব একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। এ জন্য উভয় জোটের দুই প্রধানকে বসতে হবে খোলামেলা সংলাপে। বন্ধ করতে হবে রাজনৈতিক সহিংসতা।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

২০ জানুয়ারি ২০১৪

বাংলাদেশের গণতন্ত্রচর্চার পুনর্ভাবনা

রেহমান সোবহান

ব্রিটিশ শাসন অবসানের পরবর্তী ৬৫ বছর জুড়ে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে অন্যতম যে হাহাকার বোধটি কাজ করেছে, তা হলো একটি সুষ্ঠু গণতন্ত্রের জন্য হাহাকার। যে গণতন্ত্র জনগণের, যে গণতন্ত্র জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য পরিচালিত। পূর্ব পাকিস্তান থাকাকালীন পুরো সময়টাই বাঙালি জাতি গণতন্ত্র থেকে বঞ্চিত ছিল। কারণ তখনকার ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বুঝতে পেরেছিল, গণতন্ত্রের মাধ্যমে তাদের হাতে কুক্ষিগত ক্ষমতা সাধারণ মানুষের কাছে চলে যাবে। সেই সাধারণ মানুষের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বাঙালিরা।

আইয়ুব খানের এক দশকের সামরিক শাসনের উদ্দেশ্যই ছিল জনগণের শাসন ব্যাহত করা, যে কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কেবলই বেড়েছে। পাকিস্তানের স্বাধীনতার ২২ বছর পর অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার একটি সুযোগ এলেও ক্ষমতাসীনরা তা মেনে নিতে পারেনি। কারণ, নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে জনগণের চাহিদার প্রতিফলন ঘটার একটি অবস্থা সৃষ্টি হলেও হতে পারত, এ অবস্থা ক্ষমতাসীনদের আধিপত্যকে খর্ব করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

ফলে, পাকিস্তানের অংশ থাকা অবস্থায় বাংলাদেশের মানুষের গণতন্ত্রের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, তা পূরণ হওয়া ছিল অসম্ভব। গণতন্ত্রের এই অধিকার তাই বাংলাদেশকে অর্জন করে নিতে হয়েছে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, স্বাধীনতার ৪৩ বছর পরও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের এই গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা এখনও সুদূরপরাহত। আমি এখানে আমাদের এই হতাশার মূল কারণগুলো তুলে ধরার এবং কিছু সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবো যার মাধ্যমে আমাদের রাজনৈতিক নেতা ও বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চর্চার বিষয়টিকে নিয়ে নতুন করে ভাবার সুযোগ পাবেন।

১. আমরা এখনও নির্বাচনের জন্য একটি সর্বজনস্বীকৃত পন্থা খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষায় আছি।

- আমাদের সংবিধান অনুযায়ী সবসময়ই একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে হওয়া নির্বাচনে সেই সরকারের পরিবর্তন হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আমরা দেখিনি।
- অর্থাৎ ক্ষমতা হারানোর ভয়কে উপেক্ষা করে নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার কোনো উদাহরণ আমাদের সামনে নেই।
- ষাটের দশক থেকে শুরু করে আশির দশকের শেষ পর্যন্ত নির্বাচনকেন্দ্রিক আমাদের এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই একটি অনির্বাচিত, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা জন্ম নেয়। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখার কারণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে পূর্ববর্তী সরকারের পতন হয় এবং অন্য একটি দল নতুন সরকার গঠন করে।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই ব্যবস্থা সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, আদালতের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। পরবর্তী সময়ে, ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে পুনর্মঞ্চায়িত হয় নব্বই পূর্ববর্তী নির্বাচনের সেই একই ধারা; আবার সরকার গঠন করে ক্ষমতাসীনরাই।
- ব্রিটিশ শাসন অবসানের ৬৫ বছর আর স্বাধীনতার ৪৩ বছর পর আজ আমাদের নির্বাচনের এমন একটি পদ্ধতি খুঁজতে হচ্ছে, যা আমাদের সংবিধান ও ইতিহাসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে। এই খোঁজ চলাকালীন আমাদের দুটি বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন; তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আমাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা এবং স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে রাজনীতিবিদদের প্রচলিত ব্যবস্থা অপব্যবহারের প্রবণতা।

২. তবে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হলেই যে একটি সরকার জনগণের সরকার হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। সিপিডি-র রওনক জাহানের গবেষণাসহ অন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতামত অনুযায়ী আমাদের সংসদগুলোতে ব্যবসায়ীরা

প্রভাবশালী। কেউ কেউ সংসদে আসার জন্য ব্যবসাকে ব্যবহার করছে। আবার সংসদ সদস্য থাকা অবস্থায় ব্যবসায়ী হয়ে উঠছে অনেকে। যার ফলে সংসদীয় রাজনীতি হয়ে উঠেছে গুটিকয়েক মানুষের স্বার্থ রক্ষার একটি ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থায় ক্রমাগত কমে আসছে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব। যেমনটি ছিল পাকিস্তান শাসনামলে।

- এরকম একটি জনবিমুখ প্রেক্ষাপটে, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধিত্ব না থাকায়, 'জনগণের দ্বারা সরকার'–এর যে ধারণা, তার প্রতিফলন হচ্ছে না একেবারেই। আর এই ধরনের প্রতিনিধিত্বহীন সরকারের কাছে জনমুখী নীতি কখনোই গুরুত্ব পাচ্ছে না।
- তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের শুধু সুষ্ঠু ও সবার অংশগ্রহণভিত্তিক নির্বাচন নিয়ে চিন্তা করলেই হবে না। বরং এমন একটি নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবতে হবে, যার মাধ্যমে সংসদে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠদের জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার এই প্রয়োজনীয়তা শুধু বাংলাদেশের নয়, একই প্রক্রিয়া দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেখানে জনগণের দোহাই দিয়ে ধনীদের দ্বারা গঠিত ধনীদের সরকার সর্বোচ্চ আদালত দ্বারা সুরক্ষিত অবস্থায় টিকে থাকে।

৩. যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম, নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব অগণতান্ত্রিক, সেখানে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের বাস্তবতা আমাদের আরেকবার ভেবে দেখা দরকার। এই পরিস্থিতির জন্য খুব সহজেই রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দোষারোপ করা যায়। কিন্তু যে বিষয়টির গভীর পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন তা হলো, কেন এবং কীভাবে দলের দ্বিতীয় সারির নেতাকর্মীরা (যাদের অনেকেরই রাজনৈতিক অঙ্গনে পদচারণা অনেক দিনের) তাদের গণতান্ত্রিক দায়িত্ববোধ বিসর্জন দিয়ে অন্ধভাবে একটি পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বকে আঁকড়ে ধরে আছে?

৪. বাংলাদেশের রাজনীতির আরও একটি মৌলিক সমস্যা হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আদর্শগত বিরোধ। এ বিরোধ রুয়ান্ডার হুটু ও টুটসিদের মধ্যকার বিভেদের মতোই প্রকট। যার ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে স্বাভাবিক সংলাপের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। সংসদ বর্জনের যে সংস্কৃতি গত চারটি সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তাতে প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে সংসদ। এতে পুরো সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকাহীনতা এবং সরকারি দলের একক আধিপত্যের একটি ধারা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাই, যেকোনো মূল্যে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়াটা রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য জীবিকা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, এমনকি জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার, অর্থাৎ সার্বিকভাবে অস্তিত্ব

রক্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান সহিংস অবস্থা আমাদের রাজনৈতিক আদর্শগত বিরোধেরই বহিঃপ্রকাশ।

৫. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সহিংসতার আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারটির উত্থান নিকট অতীতে হলেও, দল, ধর্ম বা আদর্শগত বিভিন্ন দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশই এরই মধ্যে এ ধরনের সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছে। এ শুধু এশিয়া নয়, সারা বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমাদের বুঝতে হবে, সহিংসতা বন্ধে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে, শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, নাকি একে অপরকে ধ্বংস করাটাই একমাত্র উপায়?

গণতন্ত্রচর্চা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা বা কাঠামোগত দুর্বলতা – কোনোটিই বাংলাদেশের একক সমস্যা নয়। দক্ষিণ এশীয় বেশির ভাগ দেশই নানাভাবে এই সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়াতে গণতন্ত্র পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আঞ্চলিক সংলাপের আয়োজন করা যেতে পারে, যা রাজনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞ সবার জন্যই একটি শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা হবে। তবে একজন বাংলাদেশী হিসেবে, একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার আশায় পাঁচ দশক পার করার পর, এখন আমার মৌলিক দাবি এমন একটি পরিবর্তন, যা আমার দেশের রাজনৈতিক অপব্যবস্থার সংশোধন করবে।

আমি অথবা আমার প্রজন্ম 'জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য' একটি সরকার পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হইনি। আমি আশা করি, বর্তমান প্রজন্ম, আমাদের প্রজন্মের রেখে যাওয়া অমীমাংসিত প্রশ্নগুলোর কার্যকর উত্তর খুঁজে বের করতে পারবে। আর এর মাধ্যমেই লাখো শহীদের রক্তে অর্জিত গণতন্ত্রের অধিকার বাংলাদেশের মাটিতে অক্ষুণ্ন থাকবে।

যুগান্তর
৬ মার্চ ২০১৪

অনুবাদঃ কোরেশী সানিন

সমঝোতা, সহনশীলতা বাড়ানো প্রয়োজন

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, রাজনৈতিক সমঝোতা আর সহনশীলতা বাড়ানো প্রয়োজন। বাড়াতে হবে সংহতিবোধ, ঐক্যচিন্তা। স্বাধীনতা দিবসে প্রত্যাশার কথা জানতে চাইলে গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনকে তিনি এ কথা বলেন। খ্যাতিমান এ অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রত্যাশা করে বলেন, "স্বাধীন বাংলাদেশে এমন অর্থনীতি চাই, যেখানে কেউ না খেয়ে রাতে ঘুমাতে যাব না। যেখানে সব যুবকের কর্মসংস্থান হবে।" তিনি বলেন, "এমন স্বাধীন বাংলাদেশ চাই, যেখানে কোনো শিশু জন্মগ্রহণের সময় মারা যাবে না। সন্তান প্রসবকালে কোনো মা মারা যাবেন না। শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে। বিপুল সংখ্যক মেয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে বেরুবে। নারীর উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত হবে।" দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, "প্রগতিমুখী রাজনৈতিক চর্চা বাড়াতে হবে। দেশে জনমুখী আধুনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাও জরুরি।"

বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৬ মার্চ ২০১৪

সুশীল সমাজের প্রভাব আগের চেয়ে কমেছে

রেহমান সোবহান

প্রথম আলোঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতিকে আপনি কীভাবে বিশ্লেষণ করেন?

রেহমান সোবহানঃ গত ৫ জানুয়ারির নির্বাচন আওয়ামী লীগের ৬৫ বছরের গণতান্ত্রিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় এবং তা গণতন্ত্রকে দুর্বল করেছে। ঐতিহাসিকভাবে আওয়ামী লীগ সেই ১৯৪৯ সাল থেকে প্রতিটি গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এবং অবাধ নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করার মধ্য দিয়ে সব সময় ক্ষমতায় এসেছে। তাদের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি কতটা নষ্ট হয়েছে, সে সম্পর্কে ক্ষমতাসীন জোটের ১৫৩ জন সদস্যের চেয়ে বেশি আর কেউ সচেতন হতে পারেন না, যারা একটিও ভোট না পেয়ে জনপ্রতিনিধি হিসেবে দশম জাতীয় সংসদের সদস্যের শপথ নিয়েছেন।

প্রথম আলোঃ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আপনার মন্তব্য কী? এ রকম একটি নির্বাচন কি বৈধতা দাবি করতে পারে?

রেহমান সোবহানঃ ৩০০ জন সাংসদের মধ্যে ১৫৩ জনকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দশম সংসদে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন থেকে প্রকাশিত সরকারি হিসাব অনুযায়ী, অবশিষ্ট ১৪৭টি আসনের সদস্যরা ৪০ শতাংশ ভোটার উপস্থিতির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন। এসব সংখ্যার হিসাব এটাই প্রতিষ্ঠা করে যে নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে আনুমানিক ১৮ শতাংশ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। এ রকম একটি নির্বাচন ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ

নির্বাচনের চেয়ে কোনো অংশেই বেশি বিশ্বাসযোগ্য নয়। ওই নির্বাচনে ২৬ শতাংশ ভোটার তাদের ভোট দিয়েছিলেন বলে সরকারিভাবে জানানো হয়। ১৯৯৬ ও ২০১৪ উভয় নির্বাচনেই বাস্তবতার চেয়ে বেশি ভোট পড়েছে বলে দাবি করা হয়। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যুক্তিসংগতভাবেই প্রশ্ন ওঠার কারণে বিএনপি সরকারের বৈধতা মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ওই সরকার তখন সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনী এনে জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভোটারবিহীন নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার প্রথম দিন থেকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ছিল এবং শাসনকালের মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তারা কোনো উৎসাহ পায়নি। দশম সংসদের সদস্যরা এবং তাদের সমন্বয়ে গঠিত সরকারকে তাদের দুর্বল ম্যান্ডেট নিয়ে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে না এবং মনে হচ্ছে তারা মনে করে যে বিরোধীদের যেকোনো চ্যালেঞ্জকে ব্যর্থ করে দিয়ে টিকে থাকতে পারবে। এ ধরনের মনোভঙ্গির মধ্যে আছে বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।

প্রথম আলো: আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই পরিস্থিতিকে কীভাবে নেয়? কোনো আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে কি?

রেহমান সোবহান: আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ, যদিও সবাই নয়, ৫ জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। বাংলাদেশে নির্বাচনকে ঘিরে সহিংসতার ব্যাপারে জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ সচিবালয়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং এ ধরনের ঘটনার অবসানের আহ্বান জানিয়েছে। তারা গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন পদ্ধতি প্রণয়নের লক্ষ্যে সংলাপ অনুষ্ঠানের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে ভারত ও চীনের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে বার্তা এসেছে। পাশাপাশি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কাছ থেকে অভিনন্দন প্রাপ্তির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে কোনো জোরালো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেবে বলে এখন পর্যন্ত ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশকারী ওই দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতেরা বঙ্গভবনে ১২ জানুয়ারি সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। কয়েকটি দেশের দূতেরা নির্বাচনের মান নিয়ে হতাশা প্রকাশ করলেও নির্বাচিত নতুন প্রশাসনের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তবে সেই হতাশা বাংলাদেশে বিদেশি সহায়তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।

অবশ্য আজকের বাংলাদেশে বিদেশি সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্যের বিষয়টি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি কেবল অর্থনীতি নয়, লাখ লাখ পরিবারের জীবিকার ওপর প্রভাব ফেলে। আমাদের প্রধান দুটি বাজার হিসেবে বিবেচিত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এমন অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের ক্ষমতা রাখে, যাতে তাদের বাজারে আমাদের রপ্তানি কমে যেতে পারে। তবে সে ধরনের আশঙ্কা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। আমরা একটি সার্বভৌম দেশ এবং যেকোনো ধরনের আন্তর্জাতিক চাপের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর স্বাধীনতা আমাদের রয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কোনো পদক্ষেপের চড়া মূল্য যদি সাধারণ জনগণকে দিতে হয়, তখন এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জোরালো জনসমর্থন প্রাপ্তির ব্যাপারে সরকারকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে।

প্রথম আলো: বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে ভারত একটি ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে?

রেহমান সোবহান: অংশগ্রহণবিহীন হলেও একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা রক্ষার পথে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ভারত তুলনামূলক বেশি সহানুভূতিশীল অবস্থান নিয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। তবে, এ রকম ভালো বন্ধুও একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্রের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে কদাচিৎ নির্বিকার থাকতে পারে, যাদের এবারের নির্বাচনী ম্যান্ডেট ২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনে অর্জিত ম্যান্ডেটের একটি ভগ্নাংশমাত্র। তাছাড়া, ভারতের বর্তমান সরকার নিজেই একটি সন্ধিক্ষণে রয়েছে এবং এ সরকার হয়তো আগামী তিন থেকে চার মাসের বেশি ক্ষমতায় থাকবে না। এ ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে যেকোনো সরকার তাদের বৈদেশিক নীতিতে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তনে আগ্রহী হয় না। তাই আমাদের এমনটা আশা করা উচিত হবে না যে আগামী এপ্রিলে অনুষ্ঠেয় লোকসভা নির্বাচনের পর নয়াদিল্লিতে নতুন একটি সরকার দায়িত্ব গ্রহণের আগে বাংলাদেশের বিষয়ে ভারত খুব একটা সক্রিয় ভূমিকা নেবে।

প্রথম আলো: বিএনপি হরতালের মতো কর্মসূচি দিয়ে কোনো সুফল পাবে কি?

রেহমান সোবহান: খালেদা জিয়া গত ১৫ জানুয়ারি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে বৈঠকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা হরতালের মতো কর্মসূচি বন্ধ রেখে শান্তিপূর্ণ বিকল্প উপায়ে রাজনৈতিক সংহতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাবেন বলে জানিয়েছেন। নীতি এবং প্রাজ্ঞ রাজনীতির বিবেচনায় এটি একটি সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত। হরতাল হচ্ছে প্রতিবাদ করার একটি উপায়। কিন্তু বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটি গত কয়েক বছরে সব ধরনের রাজনৈতিক তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে। খুব সামান্য লোক আজকাল প্রতিবাদ জানানোর

লক্ষ্যে হরতাল পালন করে। এখন যেভাবে হরতাল পালিত হয় তা কেবল সহিংসতার হুমকি দিয়ে লোকজনকে কাজে যেতে বাধা প্রদানের মধ্যেই সীমিত রয়েছে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে বিএনপির মিত্র জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন ধরনের গণপরিবহন লক্ষ্য করে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করে, যাতে সুনির্দিষ্টভাবে সাধারণ নাগরিকেরাই আক্রমণের শিকার হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় হরতাল চলাকালে হতাহতের সংখ্যা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেড়েছে। ঢাকার মতো পুলিশবেষ্টিত অঞ্চলে হরতালের প্রভাব সামান্য হলেও দূরপাল্লার আন্তঃনগর যানবাহন চলাচলে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এ ছাড়া বিপনন, যোগাযোগ ও গণপরিবহনের ওপর নির্ভরশীল নাগরিকদের দূরপাল্লার যাতায়াত বিপর্যস্ত হচ্ছে। অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিএনপির ভাবমূর্তি অনেকটাই নষ্ট হয়েছে, বিশেষ করে, জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে মৈত্রীর কারণে। দলটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আন্দোলনের পরিবর্তে যুদ্ধাপরাধের বিচার-প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে রাস্তায় সহিংসতা বাড়ানোর কৌশল বেছে নিয়েছে। যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রতি জনগণের সমর্থন রয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর সহিংসতা তাই অত্যন্ত অজনপ্রিয় হয়েছে, যাতে করে বিএনপির আন্দোলনের কর্মসূচির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

প্রথম আলো: সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনাও ঘটছে।

রেহমান সোবহান: সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অবলম্বনের কাজটি অত্যন্ত জঘন্য এবং কাপুরুষোচিত। কারণ, জনগণের সবচেয়ে অরক্ষিত অংশটি এই সহিংসতার লক্ষ্যে পরিণত হয়, যাদের প্রতিরোধের সামর্থ্য সবচেয়ে কম। আর যুদ্ধাপরাধের বিচার-প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে এ ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতা হলে সেটা আরও নিন্দনীয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এ ধরনের সহিংসতার ঘটনা নতুন নয় এবং রামুর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনার পর থেকে বেড়েই চলেছে। ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ও পরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সুনির্দিষ্ট হামলার সব রকম সম্ভাবনা ছিল। কারণ, তারা চিরাচরিতভাবে আওয়ামী লীগকেই ভোট দিয়ে থাকে – এমন ধারণা প্রচলিত রয়েছে। অতএব, সম্ভাব্য হামলা এড়াতে নির্দিষ্ট এলাকাগুলোতে আরও ভালো সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল। অপরাধী যে-ই হোক না কেন, এ ধরনের হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনের সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু এটিই যথেষ্ট হবে না, যেহেতু আমাদের দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনযাপন করছে। যেকোনো সরকারের আমলে তাদের দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

প্রথম আলো: অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, করণীয় কী?

রেহমান সোবহান: সহিংসতা ও হরতালের কারণে অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে কিন্তু ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে আরও ক্ষতি হতে পারে। যেসব দিনমজুর ও কৃষক তাদের ফসল বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন তারা সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত। সব ব্যবসাই নির্ভরশীল পরিবহনব্যবস্থার ওপর। পণ্য সরবরাহ ও বাজারব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটলে ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং ব্যয় বৃদ্ধি পায়। তবে, রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্বল্পমেয়াদি প্রভাব, অন্তত সামষ্টিক অর্থনীতিতে, জিডিপি ও রপ্তানি বৃদ্ধির ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়। এটিকে অতিরঞ্জিত করা উচিত নয়। অব্যাহত রাজনৈতিক সংকটের প্রতিক্রিয়ায় আসলে অনিশ্চয়তার ওপরই জোর দিতে হয় এবং যা নতুন বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ওপর প্রভাব ফেলে এবং আমাদের রপ্তানি বাজারকে বড় ধরনের হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। অর্থমন্ত্রীর প্রতি সুপরামর্শ, বর্তমান রাজনৈতিক অচলাবস্থায় অর্থনীতি রক্ষার স্বার্থে স্বল্পমেয়াদি কিছু উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করতে হবে এবং তাতে বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ ধরনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বিরোধী দল জনস্বার্থের প্রতি তাদের অঙ্গীকারের প্রমাণ দিতে পারে।

প্রথম আলো: কোনো অর্থবহ সংলাপের সম্ভাবনা কি এখনো আছে?

রেহমান সোবহান: সংলাপ আয়োজন করা সব সময়ই সম্ভব কিন্তু এটির কার্যকারিতা নির্ভর করবে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণমূলক একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে মীমাংসায় পৌঁছানোর ব্যাপারে উভয় দলের সদিচ্ছার ওপর। ক্ষমতাসীন জোট যদি মনে করে, যত দিন পর্যন্ত বিরোধী দল রাজপথে আন্দোলন পরিচালনার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে না পারে, ততদিন তারা সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যেতে পারবে, তাহলে সরকার সংলাপের ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়ে উঠতে পারে। এই নেতিবাচক উদ্দীপনার প্রভাব বিরোধী দলের ওপরও পড়তে পারে, যারা বিক্ষোভ-আন্দোলন অব্যাহত রাখার বিষয়টিকে সম্ভাব্য আগাম নির্বাচনে (একাদশ সংসদ) জয়লাভের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার বাধ্যতামূলক উপায় মনে করতে পারে। এ ধরনের আন্দোলন থেকে চাপের মাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিএনপিকে রাজপথে জামায়াতের সহিংস কর্মকাণ্ডের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হতে হবে। সংলাপের মধ্য দিয়ে আরও গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ফিরে আসার লক্ষ্যে উভয় জোট যদি এ ধরনের বিকৃত কৌশল পরিহার না করে, তাহলে রাজপথে সহিংসতা ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কবলে পড়ে বাংলাদেশকে আবার একটি বছরব্যাপী অনিশ্চয়তায় পড়তে হতে পারে।

প্রথম আলো: নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি কি গণতন্ত্রে রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য?

রেহমান সোবহান: যেকোনো ধারণা, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাসহ, গ্রহণযোগ্য হবে, যদি সেটি, গণতন্ত্রকে উন্নীত করে এবং প্রধান দলগুলোর সমর্থন অর্জন করে। গণতন্ত্রে চিরন্তন কোনো ধারণা নেই। আসলে এটি মূলত এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যাতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে কোনো ধরনের ভয় বা জবরদস্তি বা সহিংসতার হুমকি ছাড়াই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিএনপি ১৯৯৬ সালে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে প্রবর্তন করেছিল। এটি তৎকালীন বাংলাদেশে সব রাজনৈতিক দলের কাছে পরিপূর্ণভাবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ, ১৯৯৬ থেকে ২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিজেদের দীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলনের ফসল হিসেবে বিবেচনা করেছে। কেবল ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর পরই ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অগণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যটি আলোচনায় আসে এবং এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়। নবম জাতীয় সংসদে প্রতিষ্ঠা করা হয় সংবিধান সংস্কারবিষয়ক সংসদীয় কমিটি। এটি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বহাল রাখার সুপারিশ করে। এমনকি প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত করে তাঁর সংক্ষিপ্ত রায়ে পরামর্শ দিয়েছেন যে নতুন বিকল্প ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত সংসদ চাইলে আরও দুটি নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

প্রথম আলো: এ রকম নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা নিয়ে সংকটের সমাধান অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে কি?

রেহমান সোবহান: অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে যেকোনো সমাধান, এমনকি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন না করেও, সম্ভব যদি সব দল সদিচ্ছা নিয়ে গণতন্ত্র রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছায় এবং কীভাবে সর্বোত্তম উপায়ে সেটি করা যায়, তা নির্ধারণ করে। প্রচলিত ব্যবস্থায় যেকোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন আনতে হলে রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজ – উভয় পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এ রকম সমঝোতা বা দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্তের জন্য গণভোট বা অন্তত নির্বাচনী ম্যান্ডেটের সহায়তা নেওয়া হবে বলে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে অন্তর্ভুক্তি থাকা উচিত।

প্রথম আলো: আগামী দিনগুলো সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

রেহমান সোবহান: অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতাসীন জোটের নীতির প্রতি সহানুভূতিশীল একজন ব্যক্তি হিসেবে এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার সুবাদে আমি গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটায় উদ্বিগ্ন। ওই ঐতিহ্য চালু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। ক্ষমতাসীন জোটকে তাদের গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেট পুনরুদ্ধার করতে হবে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও পূর্ণ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে, যেখানে তারা সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাতে পারবে। একটি জোরালো রাজনৈতিক ম্যান্ডেটের অনুপস্থিতিতে যেকোনো ক্ষমতাসীন জোটের জন্য আগামী পাঁচ বছর বাংলাদেশ শাসন করতে গেলে, সামনের দিনগুলো অনিশ্চয়তাময় ও বিপজ্জনক হয়ে পড়বে, বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী যদি যুদ্ধাপরাধের বিচার-প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাদের অজনপ্রিয় সন্ত্রাস অভিযান অব্যাহত রাখে। যুদ্ধাপরাধের বিচারবিরোধী আন্দোলন থেকে পৃথক হওয়ার জন্য বিএনপিকে রাজি করার কঠিন উদ্যোগটি নবনির্বাচিত সরকারকেই নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে একাদশ সংসদ গঠনের জন্য আগাম নির্বাচনের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলতে হবে, যা হবে অধিকতর অংশগ্রহণমূলক। যা হোক, এ ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশে আগামী পাঁচ বছরের জন্য খুব কমই শান্তি আসতে পারে, যদি বিজয়ীরা তখনো বিরোধী দলকে উপেক্ষা ও নির্যাতন করার মধ্য দিয়ে নিজেদের নির্বাচিত স্বৈরশাসক হিসেবে ভাবতে শুরু করে।

প্রথম আলো: সুশীল সমাজের ভূমিকা কী?

রেহমান সোবহান: বাংলাদেশে সুশীল সমাজ বিভক্ত। ১৯৯০ সালের শেষ নাগাদ এরশাদের স্বৈরাচারী সরকারের পতনকাল পর্যন্ত সুশীল সমাজ তুলনামূলক বেশি ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং গণতন্ত্রে পুনরায় উত্তরণের জন্য রাজনৈতিক সমাজের সঙ্গে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণও ছিল। গণতন্ত্রের কারণেই সুশীল সমাজের মতামত এবং প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

নতুন গণতান্ত্রিক যুগে সুশীল সমাজ নিজেই বিভক্ত হয়ে আছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি পক্ষ এবং ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন পরবর্তী যুগের প্রতি সহানুভূতিশীল একটি তুলনামূলক ছোট একটি পক্ষের মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি অধিকতর জোরালো সমর্থনকারী সুশীল সমাজের ওই অংশগুলোর মধ্যে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আরও বিভক্তি রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি অংশের অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে বর্তমানে ক্ষমতাসীন জোটের রাজনীতির পক্ষে, আর অপর অংশটি জোটের এজেন্ডার প্রতি

সহানুভূতিশীল হলেও ক্ষমতায় থাকাকালীন তাদের যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় তার সমালোচনা করতে পিছপা হয় না। এসব বিভক্তি ও উপবিভক্তির পরিণামে বাংলাদেশের সুশীল সমাজ রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনাচারকে চ্যালেঞ্জ করতে বা সংস্কারের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখতে কদাচিৎ সমর্থ হয়েছে। গণতন্ত্র বা জনস্বার্থমুখী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কোনো কর্মকাণ্ডে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হতে তাদের অনিচ্ছার কারণে সুশীল সমাজের প্রভাব আগের চেয়ে আরও দুর্বল হয়েছে।

প্রথম আলো: আপনাকে ধন্যবাদ।

রেহমান সোবহান: ধন্যবাদ।

প্রথম আলো
২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

সাক্ষাৎকার: আব্দুল কাইয়ুম

রাজনৈতিক দল: তখন ও এখন

রওনক জাহান

১৯৬০-এর দশকের শেষ ভাগে যখন নিজের পিএইচডি থিসিসের গবেষণার জন্য আমি রাজনীতিকদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, সে সময় বাঙালি ও পাকিস্তানি রাজনীতিকদের মধ্যে একটি ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করেছিলাম। যেসব পাকিস্তানি রাজনীতিকের সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছি, তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন সম্পদশালী। তাঁদের বাসভবন ছিল বেশ বড়, ব্যক্তিগত গাড়িও ছিল তাঁদের। আর আমি সাক্ষাৎকার শুরু করার পরপরই বেয়ারা একটি ছোট ট্রলিতে চা ও হরেক রকম নাশতা নিয়ে আসত। অন্যদিকে বাঙালি নেতারা থাকতেন খুবই সাধারণ বাড়িতে, তাঁদের কোনো গাড়ি ছিল না, সোফা ছিল না আর কোনো বেয়ারাও ট্রলিতে চা-নাশতা নিয়েও আসত না।

চল্লিশ বছর পর ২০১০-১২ সালে আমি যখন আবার সংসদ ও রাজনৈতিক দলের ওপর গবেষণা শুরু করি, তখন আবার বাঙালি রাজনীতিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরু করি। এ সময় দেখলাম, বাঙালি রাজনীতিকদের বৈষয়িক ভাগ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। গত কয়েক বছরে যেসব রাজনীতিকদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাঁরা সবাই বনানী ও গুলশান এলাকার বড় বড় বাড়িতে বাস করেন, তাঁদের সবারই গাড়ি আছে; আর সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় চা ও নানা রকম নাশতা দিয়ে আমাকে আপ্যায়ন করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে বলতে হয়, বাঙালি রাজনৈতিক নেতাদের এই সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভাবমূর্তি তেমন উজ্জ্বল হয়নি। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রাজনৈতিক দল ও নেতাদের ইতিবাচক ভূমিকার কথা আমরা স্মরণ করেছি, এমনকি ১৯৮০-এর দশকেও গণতন্ত্রের আন্দোলনে তাদের উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার হওয়ার

পর তাদের ভাবমূর্তি ক্রমাগত নিম্নগামী হতে শুরু করে। রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি ও অপরাধমূলক তৎপরতায় সংশ্লিষ্টতার খবর আমরা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে হরহামেশাই জানতে পারি।

মনে হয়, তারা বস্তুত আইনের ঊর্ধ্বে চলে গেছেন। অনেক পর্যবেক্ষকই মনে করেন, রাজনীতির দুর্নীতিকরণ এবং রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতন্ত্রহীনতার কারণেই বাংলাদেশে গণতন্ত্র সংহত হচ্ছে না।

রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক ভূমিকার অবক্ষয়

১৯৯১ সালে নির্বাচনমুখী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনর্প্রবর্তন হওয়ার পর মূল ধারার দলগুলো সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে নিজেদের সমর্থক সৃষ্টি করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে। এর ফলে তাদের আদর্শিক ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়, নীতিও দুর্বল হয়ে পড়ে। পরিণামে, দলগুলো জনগণের প্রত্যাশামাফিক কাজ যেমন, বিভিন্ন দুর্বল জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ, নেতাদের প্রশিক্ষণ, নীতি প্রণয়ন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সংহতকরণ – এসব বিষয়ে কিছু করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমাগত পৃষ্ঠপোষক ও সুবিধাভোগীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, আদর্শ বা নীতি দূরবর্তী ব্যাপারে পরিণত হয়। সম্পদ লাভের যে প্রতিযোগিতায় তারা নামে, তার ফলে ব্যাপক দুর্নীতি ও অপরাধপ্রবণতা বেড়ে যায়। দলের ভেতরেও এসব লুটপাটের ভাগের কারণে নানা রকম উপদল গড়ে ওঠে। ফলে দলের ভেতরে শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। উপদলীয় কোন্দল ও নেতাদের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটে, নানা রকম চক্রও গড়ে ওঠে। দলের সর্বোচ্চ নেতাই শুধু এসব কোন্দল মেটানোর ক্ষমতা রাখেন। অন্যদিকে এক ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীলতা, অর্থাৎ বিধানের চেয়ে নেতার ওপর নির্ভরশীলতার কারণে এসব উপদলীয় কোন্দল মেটানোর অন্যান্য গণতান্ত্রিক পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

বছরের পর বছর ধরে দলগুলোর ভেতরে ক্ষয়িষ্ণু গণতান্ত্রিক ধারা লক্ষ করা গেছে। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, দল পরিবারকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। দলের কাউন্সিলে বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত না হয়ে মনোনয়ন প্রথা শুরু হয়। দলের গঠনতন্ত্রে তৃণমূলের হাতে নেতা নির্বাচনের ক্ষমতা থাকলেও বস্তুত তাদের ক্ষমতা খুবই সীমিত। দলের আদর্শিক ও নীতিগত বিষয়ে খুব সামান্যই তর্ক-বিতর্ক হয়। মূল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সাধারণত দলের প্রধান নেতাই নিয়ে থাকেন। দলের প্রচারকাজ ও তহবিলের উৎস সাধারণত অস্বচ্ছ।

রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমাগত ধনী ব্যক্তিদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে; এই ব্যক্তিরা বস্তুগত স্বার্থে দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। তারা দলের তৎপরতায় যুক্ত হন একটি ব্যবসায়ী বিনিয়োগের মনোভাব নিয়ে।

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দেখা যায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃত্বে এক দল ক্ষমতাধর মানুষ আসীন হয়েছেন, যাঁরা সহিংসতার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের স্বার্থে তা ব্যবহার করেন। এর মাধ্যমে তাঁরা প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখেন। এ কারণে দলগুলোর মধ্যে আন্তঃদলীয় ও অন্তর্দলীয় কোন্দল বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে গণতন্ত্রই হুমকির মুখে পড়ে গেছে। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তে দেখা গেছে, দলগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সংঘাতের চেয়ে উপদলীয় কোন্দলের কারণেই বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে বা আহত হচ্ছে। আর ক্ষমতাসীন দলের মধ্যেই এসব উপদলীয় কোন্দল বেশি দেখা যায়।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থা

যে বিশ্বাস বাংলাদেশে ক্রমেই জোরালো হচ্ছে তা হলো রাজনৈতিক দলগুলো দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তনের প্রত্যয় ব্যক্ত করলে বা দলের ভেতরে গণতন্ত্রচর্চার চেষ্টা করলেই শুধু গণতন্ত্র টেকসই হতে পারে। দেশে গণতন্ত্র সুসংহত করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

প্রথমত, নিজেদের সমর্থকদের সুবিধা দেওয়া ও প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। গণতন্ত্রের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে আইনের শাসন। রাজনৈতিক দলগুলো যদি দলীয় স্বার্থে রাষ্ট্রের ব্যবহার বন্ধ না করে, তাহলে আইনের শাসন কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না।

দ্বিতীয়ত, উপদলীয় ও আন্তঃদলীয় কোন্দল নিরসনে সহিংসতার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। এক দলের সঙ্গে অন্য দলের, একই দলের ভেতরে বিভিন্ন উপদলের এবং দলগুলোর সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘাতের কারণে দ্বন্দ্ব নিরসনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

তৃতীয়ত, বিরোধী দলে থাকার সময় দলগুলোর সংসদ বর্জনের রীতি বর্জন করতে হবে। সরকারের জবাবদিহির জন্য সংসদকেই কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

চতুর্থত, রাজনৈতিক দলগুলোকে সমর্থকদের সুবিধা বিতরণের জায়গা থেকে সরে এসে বিধান ও নীতিভিত্তিক সংগঠনে পরিণত হতে হবে। দলগুলো পৃষ্ঠপোষক-সুবিধভোগী নেটওয়ার্ক বিস্তারে ব্যস্ত থাকায় গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করতে পারছে না। তারা নানা কারণেই দুর্নীতি ও অপরাধমূলক তৎপরতার ওপর নির্ভরশীল।

পঞ্চমত, রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত সরকার ও দলের মধ্যে একটি পার্থক্যরেখা টানা। দলের নেতারা, যেমন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য পদধারী ব্যক্তিরা পুরো সময় দলের জন্যই ব্যয় করবেন, কোনো সরকারি দায়িত্ব যেমন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী প্রভৃতি পদে তাদের নিয়োগ দেওয়া চলবে না। এই পৃথকীকরণ সম্ভব হলে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করা সম্ভব হবে, সব উৎকৃষ্ট গণতন্ত্রেই তারা এ কাজটি করে থাকে। ক্ষমতাসীন দলের একটি প্রধান কাজ সরকারের নীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, এসবের সমালোচনা করা ও জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা। সরকারের সমর্থকগোষ্ঠী তৈরি করাই ক্ষমতাসীন দলের একমাত্র কাজ নয়।

সবশেষে, রাজনৈতিক দলগুলোর কাজ হবে সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে দুর্বল জনগোষ্ঠীর স্বার্থ প্রতিফলিত ও তা ব্যক্ত করা এবং যথাযথ নীতি প্রণয়ন করে সেটা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া। রাজনৈতিক দলগুলো এখন ক্রমাগত ব্যবসায়ী মহলের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, ফলে সরকারের নীতিতে অন্যান্য সামাজিক মহলের বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থ প্রতিফলিত হচ্ছে না। যদিও এই মানুষেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

দলের ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চা জোরদার করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত অগ্রাধিকারভিত্তিক কিছু পদক্ষেপ নেওয়া। সে ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে দলগুলোর নিজস্ব গঠনতন্ত্র ও গণপ্রতিনিধিত্ব বিধিমালা (আরপিও) অনুসরণ করা উচিত। আরও সুনির্দিষ্ট করে যদি বলি, সব স্তরের নেতৃত্ব গোপন ব্যালটে ভোট গ্রহণের মাধ্যমে নিয়মিত নির্বাচনের প্রথা অনুসরণ করতে হবে। তৃণমূল সংগঠন যে প্যানেল নির্বাচন করবে সেখান থেকে বাছাই করে প্রার্থী মনোনীত করতে হবে। এর পাশাপাশি দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় ক্রমেই নারী, সংখ্যালঘু ও নিম্ন আয়ের মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা নিতে হবে। বিভিন্ন স্তরে দলের আদর্শিক ও নীতিগত বিতর্কের মাধ্যমে দলের ফোরাম আরও শক্তিশালী করতে হবে। বর্তমানে দলের কর্মীদের কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের তর্ক-বিতর্কের সুযোগ নেই। ওপর থেকে নেতারা যে আদেশ দেন, তারা শুধু সেটা অনুসরণ করেন। তাদের সময় কাটে বিভিন্ন ‘দিবস’ পালনের কর্মসূচির মাধ্যমে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি দলের কর্মসূচি ও তহবিলের টাকা সংগ্রহে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তাতে দলগুলো ক্রমেই বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, দুর্নীতি ও অপরাধমূলক তৎপরতার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। এটা প্রতিরোধ করতে হলে রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে দলগুলোর অর্থ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, তা সেটা নির্বাচনের জন্যই হোক বা সাংগঠনিক কাজের জন্যই হোক। ইউরোপের কিছু দেশে এই ব্যবস্থা আছে। অবশ্যই সরকারি তহবিল থেকে দলগুলোকে যে অর্থ দেওয়া হবে তা পেশাদারির সঙ্গে ব্যবস্থাপনা করতে হবে। এসব তহবিলের স্বাধীন অডিট হতে হবে, সংসদে তা পেশ করতে হবে এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। তদুপরি দলের নির্বাচনী প্রচারণা ও দলীয় তহবিলের যে সীমা আরপিওতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের উচিত তা যথাযথভাবে অনুসরণ হচ্ছে কি না, সেটার তদারকি করা। প্রচারণা ও তহবিলের অর্থের অব্যবস্থাপনা হলে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তা তদন্ত করতে হবে। আর এসব আইন ভঙ্গ করা হলে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রথম আলো
৬ নভেম্বর ২০১৪

মধ্যম আয়ের দেশ বনাম স্বল্পোন্নত দেশ

ফাহমিদা খাতুন

বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বের দেশগুলোকে তাদের আয় এবং কিছু সামাজিক সূচকের ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে থাকে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বব্যাংক এবং জাতিসংঘ আলাদা আলাদা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। যেমন, বিশ্বব্যাংক ঋণ প্রদানের সুবিধার জন্য সদস্য-দেশগুলোকে নিম্ন-আয়ের দেশ, নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ, উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং উচ্চ-আয়ের দেশ – এই চার ভাগে ভাগ করেছে। ২০১৫ অর্থবছরে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হতে হলে বিশ্বব্যাংকের অ্যাটলাস পদ্ধতিতে মাথাপিছু আয় এক হাজার ৪৫ থেকে চার হাজার ১২৫ ডলার হতে হবে। আর উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মাথাপিছু আয় হতে হবে চার হাজার ১২৬ থেকে বারো হাজার ৭৪৫ ডলার। প্রতি বছর এই তালিকা নতুন করে তৈরি করা হয়। তবে এই ভাগটি শুধু আয়ভিত্তিক বলে এখানে কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্রটি বোঝা যায় না। কেননা, উচ্চ মাথাপিছু আয় থাকার পরও কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে অনেক দেশ সামাজিক সূচকে পিছিয়ে থাকে।

তাই জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকের ভিত্তিতে বিশ্বের দেশগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে: স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশ। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসোক) উন্নয়ন নীতিমালাবিষয়ক কমিটি বা কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) তিনটি সূচকের ভিত্তিতে তিন বছর পর পর স্বল্পোন্নত দেশসমূহের (এলডিসি) তালিকা তৈরি করে থাকে। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে আসার সূচকগুলো হচ্ছে: (ক) মাথাপিছু আয়: তিন বছরের গড় মাথাপিছু জাতীয় আয় (জিএনআই); (খ) মানবসম্পদ সূচক, যেটি পুষ্টি, স্বাস্থ্য, স্কুলে ভর্তি ও

শিক্ষার হারের সমন্বয়ে তৈরি হয়; (গ) অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক, যেটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আঘাত, জনসংখ্যার পরিমাণ এবং বিশ্ববাজার থেকে একটি দেশের দূরত্বের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। একটি দেশ যেকোনো দুটি সূচকে প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারলে, সেটি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করে। তবে ইচ্ছে করলে কোনো দেশ শুধু আয়ের ভিত্তিতেও এলডিসি থেকে বেরিয়ে আসার আবেদন করতে পারে। সেক্ষেত্রে তার মাথাপিছু আয় মূল্যায়নের বছরে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় আয়ের দ্বিগুণ হতে হবে। যেমন ইকুয়েটরিয়াল গিনি চৌদ্দ হাজার ৩২০ ডলার মাথাপিছু আয় নিয়েও স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় রয়েছে। তেমনি সার্কভুক্ত দেশ ভুটান মাথাপিছু আয় দুই হাজার ৪৬০ ডলার সত্ত্বেও একটি এলডিসি। তাই মধ্যম-আয়ের দেশ হলেই স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ঘটে না।

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১৯৭৫ সালে। ২০১২ সালে জাতিসংঘ নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশ এখনো একটি স্বল্পোন্নত দেশ, যেহেতু বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২০১৩ সালে ৯০০ ডলার, মানবসম্পদ সূচক ৫৪.৭ এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক ৩২.৪ ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০৫-০৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের যে হিসাব করেছে, সেখানে ২০১৩ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এক হাজার ৫৪ ডলার হিসাব করা হয়েছে। কিন্তু আঙ্কটাড এলডিসি রিপোর্টে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মাথাপিছু জাতীয় আয় বিশ্বব্যাংক প্রণীত অ্যাটলাস পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়ে থাকে। সব দেশের জন্য একই পদ্ধতি ব্যবহার হয় বলে এখানে সামঞ্জস্য রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশ এখনো নিম্ন আয়ের দেশ। তবে বাংলাদেশের জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির গতিধারা দেখলে সহজেই অনুমেয় যে বাংলাদেশ আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

এলডিসি থেকে উত্তরণসংক্রান্ত জাতিসংঘের পরবর্তী মূল্যায়ন হবে ২০১৫ সালে। তখন আরও দুটি দেশের সম্ভাব্য উত্তরণ-প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা হবে। দেশ দুটি হচ্ছে অ্যাঙ্গোলা ও কিরিবাতি, যাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় ২০১৩ সালে ছিল যথাক্রমে পাঁচ হাজার ১০ ও দুই হাজার ৬২০ ডলার। বাংলাদেশ ২০১৫ সালের পর্যবেক্ষণে অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে তার মাথাপিছু আয় এক হাজার ২৪২ ডলার হওয়া প্রয়োজন। তার ওপরে মানবসম্পদ বা অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকের যেকোনো একটি পূরণ করা প্রয়োজন। আর যদি শুধু মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে আমরা উত্তরণ ঘটাতে চাই, তাহলে মাথাপিছু জাতীয় আয় তিন বছর ধরে গড়ে দুই হাজার ৪৮৪ ডলার হওয়া প্রয়োজন। তাই ২০১৮ সালের আগে এলডিসি থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের নাম অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে

না। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে বাংলাদেশ সামনের বছরগুলোতে আরও অগ্রগতি সাধন করবে, তাতে সন্দেহ নেই। কেননা জিডিপি প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি, রেমিট্যান্স, খাদ্য নিরাপত্তা এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর (এমডিজি) সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অর্জন প্রশংসনীয়। তাহলে আশা করা যায়, ২০১৮ সালের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হবে। ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতিমালাবিষয়ক কমিটি ২০২১ সালে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ করবে। তখন জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতিমালাবিষয়ক কমিটি বাংলাদেশকে উত্তরণ বিষয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপনের অনুরোধ জানাবে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে জাতিসংঘের ইকোসোক, উন্নয়ন নীতিমালাবিষয়ক কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করল এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০২১ সালেই তা গ্রহণ করল। তাহলে নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্তটি কার্যকর হবে স্বীকৃতি দেওয়ার তিন বছর পর অর্থাৎ ২০২৪ সালে। ২০২১ থেকে ২০২৪-এই তিন বছরকে গ্রেস পিরিয়ড বলা হয়, যাতে দেশটির উত্তরণ-প্রক্রিয়াটি সহজ হয়। এই গ্রেস পিরিয়ডে দেশটি স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবেই থাকে। এই সময়ে দেশটি উত্তরণের কৌশল তৈরি করবে এবং জাতিসংঘের কমিটি তার উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করবে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা থাকে সব দেশেরই। কেননা, এর সঙ্গে দেশের সম্মান, আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃতি ইত্যাদি জড়িত রয়েছে। বাংলাদেশ একটি অগ্রসরমান দেশ। মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার তুলনীয় অনেক দেশের চেয়ে বেশি। আর সামাজিক খাতে বাংলাদেশের সাফল্য তো বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ! এটি আমাদের জন্য সুখকর নয়। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ঘটলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বাড়বে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আমরা এক কাতারে দাঁড়াতে পারব। কিন্তু অবকাঠামোগত দুর্বলতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব এবং সুশাসনের ঘাটতির জন্য আমরা দ্রুত অগ্রসর হতে পারছি না। মনে রাখতে হবে, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বেশ কিছু সুবিধা থেকে বঞ্চিত হব। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শুল্কমুক্ত বাজারসুবিধা। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ইত্যাদি উন্নত দেশে আমরা আমাদের রপ্তানি পণ্য, বিশেষ করে তৈরি পোশাকশিল্পের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাই। উন্নয়নশীল দেশ হলে আমরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হব। তখন আমাদের প্রতিযোগী দেশ যেমন চীন ও ভিয়েতনামের মতো একই শর্তে পণ্য রপ্তানি করতে হবে। এ ছাড়া বাণিজ্যসংক্রান্ত মেধাস্বত্ব আইন বা ট্রিপস এবং বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধাগুলো আমরা আর পাব না।

তবে প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু এই সুবিধা পাওয়ার জন্যই আমরা স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে রয়ে যাব কিনা। আর শুল্কমুক্ত সুবিধা সারা জীবন শুধু স্বল্পোন্নত দেশের জন্যও থাকবে না। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দোহা রাউন্ডের চুক্তিগুলো বাস্তবায়িত হলে শুল্ক এমনিতেই সবার জন্য কমে যাবে। তখন আর আমাদের জন্য অগ্রাধিকারমূলক শুল্কসুবিধা থাকবে না। তাছাড়া, বর্তমানে বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তিগুলোতেও শুল্ক হারে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ার সুবিধা একসময় শেষ হয়ে যাবে। তাই আমাদের লক্ষ্য হবে প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করে, মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে এবং অর্থনৈতিক নাজুকতা কাটিয়ে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আবির্ভূত হওয়া।

প্রথম আলো
১৭ ডিসেম্বর ২০১৪

নেতৃত্বের সৃজনশীলতা ও মধ্যবিত্তের উদ্যম সময়ের দাবি

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সমকাল: কেমন কাটল বছরটি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। বছরটি ভালো কাটুক, এটাই কামনা করি। বাংলাদেশ প্রায় দুই যুগ ধরে উন্নয়নের যে পথে চলেছে তার ধারাবাহিকতা বিদায়ী বছরটিতে অব্যাহত ছিল। বিশেষ করে ২০১৩ সালে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে অস্থিরতা ছিল তা বিবেচনায় রেখে বলা যায় যে, ২০১৪ সালে আপাত শান্তি ও স্থিতি বজায় ছিল। সহিংস রাজনীতি বলতে গেলে ছিলই না। এ কারণে অর্থনৈতিক কার্যক্রম অনেকটা স্বাভাবিক ছিল এবং প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী না হলেও মোটামুটি সন্তোষজনক বলা চলে। ৫ জানুয়ারির নির্বাচন যেভাবে অনুষ্ঠিত হলো সেটা সবার জানা আছে। এর প্রেক্ষাপটও জানা। নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রলম্বিত অশান্তিও আছে। এ নির্বাচনকে বাংলাদেশের জন্য প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করা না হোক, দেশ-বিদেশে নেতিবাচক প্রভাব তো রয়েছেই।

সমকাল: রাজনীতির প্রসঙ্গ কিন্তু বারবার এসেছে ...।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অর্থনীতির জন্য বছরটি মোটামুটি ভালোই ছিল। তবে এটা ঠিক যে, প্রলম্বিত অশান্তির ছায়ায় কেটেছে বছরটি। আমাদের উন্নয়ন হয়েছে, আবার রাজনীতির অঙ্গনে অস্থিরতার ছায়াও ছিল।

সমকাল: বিশ্বসমাজ না হোক, কিছু উন্নত দেশ এবং জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংকসহ কয়েকটি সংস্থা বাংলাদেশের ওপর নজর রেখেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্ব অর্থনীতির কী প্রভাব?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিশ্ব অর্থনীতি কিন্তু ২০০৮ সালের মন্দা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ফলে অনেক পণ্যের চাহিদা কম। তবে আমাদের জন্য সুবিধার দিক ছিল তেল ও তুলার মতো পণ্যের দাম কমে যাওয়া। আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য এ দুটি পণ্য অপরিহার্য। বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় ভোজ্যতেলের বেশিরভাগ আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। সম্প্রতি বিশ্ববাজারে সয়াবিন ও পাম অয়েলের দাম কমেছে। দেশের বাজারে এর প্রভাব পড়েছে।

সমকাল: আমাদের রপ্তানি বাজারের জন্য কিন্তু বছরটি উৎকণ্ঠায় কেটেছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক। সাভারের রানা প্লাজা বিপর্যয়ের পর রপ্তানি খাত হেঁচকি তুললেও এগিয়ে যেতে পারছে। তবে উদ্বেগ কাটছে না। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কেবল তৈরি পোশাক খাতে নয়, অন্যান্য পণ্যেও সমস্যা রয়েছে। জিএসপি সুবিধা স্থগিত রাখা হয়েছে এবং পুনর্বহাল হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটছে না।

সমকাল: প্রবাসে বাংলাদেশি আগের তুলনায় কম যাচ্ছে, এমনটিই তথ্য। অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন কি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি যদি টাকার অঙ্কে বা ডলারে দেখেন, তাহলে রেমিট্যান্স প্রবণতাটি ইতিবাচক। প্রবাসীরা প্রচুর অর্থ দেশে পাঠাচ্ছেন। এতে ওঠানামা রয়েছে; কিন্তু বছর শেষে ব্যাংকিং সূত্রে পাওয়া অর্থ আগের বছরের তুলনায় বেড়েছে। তবে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে কিন্তু আগের তুলনায় কম লোক যাচ্ছে। এতে দেশের শ্রমবাজারে চাপ বাড়ে।

সমকাল: বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। বিদায়ী বছরটি কেমন ছিল?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ চিত্র একেবারেই গতানুগতিক ছিল – জিডিপির ১ শতাংশের মতো। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাদ দিলে বৈদেশিক

সাহায্য বাড়েনি। একদিকে আমরা দেখছি যে, বিশ্ববাজারে জ্বালানি ও ভোজ্যতেল এবং তুলার মতো পণ্যের দাম কম বা স্থিতিশীল থাকার কারণে আমাদের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে; অন্যদিকে অর্থনীতির সব সূচক সমানভাবে ইতিবাচক নয়। প্রবাসে কর্মী প্রেরণ, রপ্তানি বাজার, বৈদেশিক সাহায্য এবং প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ – এসব ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে।

সমকাল: সামষ্টিক অর্থনীতি কেমন ছিল?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিদায়ী বছরটিতে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতি ভালোই ছিল। এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে আমি তিনটি সূচকের উল্লেখ করব। প্রথমটি মূল্যস্ফীতি। শহর ও গ্রাম সর্বত্র খাদ্য এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি নিচের দিকে ছিল, যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়নি। তবে প্রবণতাটি ইতিবাচক। দ্বিতীয়ত, টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল ছিল। এর সুফল পেয়েছে বিপুল সংখ্যক ভোক্তা। বিশেষ করে আমদানি পণ্যের দামে এর প্রভাব লক্ষ করা গেছে। মূল্যস্ফীতি কম থাকায় ব্যাংকিং খাতে সুদের হার কমানোর কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

সমকাল: কৃষি খাত কেমন ছিল?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অর্থনৈতিক স্থিতি সংহত করার ক্ষেত্রে বোরো ও আমন ফসল ভালো হওয়ার অবদান রয়েছে। আমাদের খাদ্য নিশ্চয়তা বা নিরাপত্তা বেশ শক্তিশালী। এর প্রভাবে মজুরিও স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হচ্ছে।

সমকাল: বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানি বেড়েছে বলে তথ্য রয়েছে...।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিষয়টি কিন্তু চিন্তার। আন্তর্জাতিক বাজারের কিছু বিষয় আমাদের জন্য আশার সঞ্চার করেছে। যেমন, জ্বালানি তেলের মূল্য কম থাকা। কিন্তু জিডিপির তুলনায় বিনিয়োগ হার ভালো নয়। মুদ্রানীতিতে ব্যক্তি খাতে যতটা ঋণ প্রদান করা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছিল, বাস্তবে তা অর্জন করা যায়নি। তেল-গ্যাসের বাণিজ্যিক ব্যবহারের তথ্য থেকেও বোঝা যায় যে, বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ছিল না। এর প্রভাবে কর্মসংস্থান বাজারে চাপ দেখা গেছে। তবে এ তথ্যও আমাদের সামনে রয়েছে যে, ক্যাপিটাল মেশিনারির আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এখানে শঙ্কার দিকটি হলো – এভাবে কি প্রচুর মেশিনারিজ আমদানি হয়েছে, নাকি এ সুযোগে প্রচুর অর্থ

পাচার হয়ে গেছে? ওভার ইনভয়েসিং কি ঘটেছে? এটা সত্য হলে আরও একটি শঙ্কা প্রকাশ পায়। একদিকে বিনিয়োগ পরিস্থিতি দুর্বল, অপরদিকে অর্থ পাচার। অর্থ পাচার হতে পারে আমদানি পণ্যের মূল্য বেশি দেখিয়ে অর্থাৎ ওভার ইনভয়েসিং। আরেকটি প্রবণতা সম্প্রতি লক্ষ করা যাচ্ছে – বাংলাদেশিদের পাচার করা অর্থ বিদেশি বিনিয়োগ হিসেবে দেশে নিয়ে আসা এবং এটা করা হয় ব্যাংকের মাধ্যমে। বেসরকারি খাতের কোনো কোনো উদ্যোক্তা এ অর্থের একটি অংশ বিদেশি ঋণ হিসেবে দেশে আনছেন বলেও জানা যায়। এটাও জানা যে, ২০১২ সালে যে পরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে বলে অনুমিত, তার তুলনায় নীট বৈদেশিক সাহায্য এসেছে কম। এ অর্থ দেশে বিনিয়োগ হলে সাহায্য-নির্ভরতা কম হতো। বিনিয়োগ কম মাত্রায় হচ্ছে, অথচ অর্থ পাচার হচ্ছে, এমনটি উদ্বেগ বাড়ায় বৈকি। রাজনৈতিক অস্থিরতার পুনরাবৃত্তি অর্থ পাচার বাড়াতে পারে। আরও একটি শঙ্কা কেউ কেউ প্রকাশ করছেন – বিদেশে মূলধন বিনিয়োগের জন্য অর্থ বাইরে নেওয়ার সুযোগ প্রদানে চাপ বাড়তে পারে।

সমকাল: রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ কেমন ছিল?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: পদ্মা সেতু ও রূপপুর পারমাণিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিনিয়োগ হয়েছে। কিন্তু ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-ময়মনসিংহ রোড প্রশস্ত করার প্রকল্প নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও কিছুতেই যেন শেষ হতে চায় না। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং গভীর সমুদ্রবন্দরের মতো মেগা প্রকল্পের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি। বৈদেশিক সহায়তা কম হলে এডিপি বাস্তবায়নে সমস্যা হবে। প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ বা পিপিপিও টেক অফ করল না। বিনিয়োগ না বাড়লে আমরা ৭-৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারব না। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, আমরা ৬ শতাংশের আশপাশের প্রবৃদ্ধির হারে আটকা পড়ে গেছি। এ অবস্থায় আমরা নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত জীবনে থেমে থাকব। দারিদ্র্যের কারণে আমাদের লোক হয়তো মারা পড়বে না। কিন্তু আমরা তো সচ্ছল জীবন চাই আরও বেশি বেশি মানুষের জন্য।

সমকাল: রাজস্ব আদায় চিত্র কেমন ছিল?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বছরের প্রথম দিকে কর আদায় দুর্বল ছিল। বিশেষ করে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে। কেন এমনটি ঘটেছে? এর একটি কারণ হতে পারে যে, লক্ষ্যমাত্রা ছিল উচ্চাভিলাষী, অর্থ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বেশি ধরা হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে যে, কর ফাঁকির ঘটনা বেশি ঘটেছে। আরেকটি কারণ হতে পারে, উৎপাদনশীল অর্থনীতি ভালো চলছে না। বিশেষ করে ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর কম

হওয়ার এ ধরনের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কর আদায়ের সঙ্গে যুক্তদের দুর্বলতাও আমরা ধরে নিতে পারি।

সমকাল: সার্বিক বিবেচনায় কী করণীয়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এ সরকার টানা ছয় বছর ক্ষমতায়। কিন্তু তারা কোনো বড় ধরনের সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়নি। ব্যাংকিং খাত কিংবা পুঁজিবাজারে সংস্কার নেই। বেতন কমিশনের প্রতিবেদনে সরকারি কর্মীদের বেতন অনেক বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনে সংস্কার কোথায়? স্থানীয় সরকারের কাজও গতানুগতিক – কোনো সংস্কার নেই। ২০১৫ সালে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি বাড়াতে হলে বড় ধরনের সংস্কারে হাত দিতেই হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সম্ভাব্য দুর্নীতিবাজদের তলব করছে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই দায়মুক্তি দিয়ে দিচ্ছে। সংস্কার না হলে কর আদায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়ানো সম্ভব হবে না। আমরা তো বাইপাস সার্জারি দেখি না, অন্য কোনো জটিল অপারেশন দেখি না। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, বিচার ব্যবস্থায় সংস্কার, প্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা – এসব ক্ষেত্রে সংস্কার না হলে উৎপাদন ব্যয় কমানো যাবে না। বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে এর বিকল্প নেই। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে মেধার স্থান কেন থাকবে না? ২০১৫ সালে এসব বিষয় সামনে আসুক, সেটাই চাইব। দুর্নীতির ইস্যুতে দুদকের আরও সক্রিয় হওয়া আবশ্যকীয়।

সমকাল: অর্থনৈতিক কূটনীতিতে কিন্তু সরকার সফলতার দাবি করতে পারে...।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ২০১৪ সালে আমরা কূটনীতিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ দেখেছি। চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক কৌশলগত সম্পর্ক জোরদার হয়েছে। ভারতকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক উদ্যোগ রয়েছে। জাপানের সঙ্গেও সম্পর্ক জোরদার হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক ও বিনিয়োগ বিষয়ে সম্পর্ক উন্নত হলেও বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে শীতলতা বিরাজমান। আমাদের তৈরি পোশাকশিল্প খাত কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডার নজরদারিতে রয়েছে।

সমকাল: এটা কি রাজনৈতিক কারণে, যেমনটি সরকারের কেউ কেউ দাবি করছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি সেটা মনে করি না। এটা একেবারেই মানবাধিকার ও শিল্প-সম্পর্কিত। গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো সম্পর্কে অযথা কটুকথা না বলাই ভালো।

সমকাল: গণতন্ত্র, সুশাসন এসব কিন্তু বছর জুড়েই আলোচনায় ছিল ...।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমরা প্রলম্বিত ছায়ায় রয়েছি। সূর্যের আলো পর্যাপ্ত না হলে মূল পর্যন্ত তা পৌঁছায় না। গাছ বড় হয় না। মানবাধিকার, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার, শ্রমিক স্বার্থ এসব কেবল দেশের জনগণের কাছে নয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। ভোটাধিকারের বিষয়টিও সবার বিবেচনায় থাকে। আমরা বাজার অর্থনীতি পরিচালনা করব কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে বহুমতের ধারণক্ষমতা থাকবে না – এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি বাজার অর্থনীতির পরিপূরক। এটাও মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ সর্বদা বৈশ্বিক বাজার থেকে উপকৃত হয়েছে। রেমিট্যান্স, রপ্তানি, বিদেশি সাহায্য এসব হচ্ছে জ্বলন্ত উদাহরণ। এ বছরে অনেক দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে রুটিন কাজকর্ম চালিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মনের ভেতর যা সর্বদা রয়েছে সেটা সুযোগ পেলেই উচ্চ মহলে জানিয়ে দিচ্ছে। তারা মনে করে, নিয়মিত সহায়তা কর্মসূচিগুলো স্থগিত রাখা হলে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হবে। কিন্তু নির্বাচন, সাধারণ মানুষের অধিকার – এসব নিয়ে তারা সর্বদা বলে যাচ্ছে।

সমকাল: গণতন্ত্রের প্রশ্নে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো এক সময়ে যে ধরনের মনোভাব দেখিয়েছে, বাংলাদেশে কি তেমনটি লক্ষ করা যাচ্ছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নো ডেমোক্রাসি – এটা কোনো মডেল হতে পারে না। গণতন্ত্রের বিকল্প নেই। কোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, মনস্তত্ত্ব – এসব মিলিয়ে নিজস্ব একটি ধারা তৈরি হয়। আমরা নব্বইয়ের দশকের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, গণতন্ত্রের কারণে আগের দুই দশকের চেয়ে প্রবৃদ্ধির হার ভালো ছিল। এখন আমরা পরের উচ্চতর ধাপে যেতে চাই। এখন দেখতে হবে এজন্য যা করণীয় সেটা করা হচ্ছে কিনা। আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে, বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণের আগেই বাংলাদেশ সমপর্যায়ের অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে ছিল। আমরা সামাজিক উন্নয়নের সংস্কারে পদক্ষেপ নিতে পেরেছি। এখন আরও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোগী হতে হবে এবং এটা কারও নির্দেশে নয়, স্ব-উদ্যোগেই করা চাই। যেকোনো ধরনের কর্তৃত্ববাদী মনোভাব পরিত্যাজ্য হওয়া চাই। অযথা নিয়ন্ত্রণ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিকাশের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে না।

সমকাল: আমাদের রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে চেইন এজেন্ট কে হবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এ ক্ষেত্রে অবশ্যই বলব নেতৃত্বের কথা। আমাদের নেতৃত্ব ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার প্রশ্নে সঠিক পথে চলেছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়েও তারা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দৃঢ়সংকল্প দেখাতে পেরেছে। বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখতে এখনও নেতৃত্বকেই সৃজনশীল ভূমিকা নিতে হবে। মধ্যবিত্তদেরও এগিয়ে আসতে হবে। তারা যদি নিভৃতচারী ভূমিকা থেকে বের হয়ে আসতে পারে, তাহলে বিকাশের পথ প্রশস্ত হবেই। এটাও মনে রাখতে হবে যে, যা কিছু পরিবর্তন তা দেশের ভেতর থেকেই হতে হবে। বৈদেশিক ঘটনাবলী পরিপূরক হতে পারে, উদ্যোক্তা নয়। নতুন বাংলাদেশের পথে যাত্রা শুরু হোক, এটাই বছরের শেষ দিনের প্রত্যাশা।

সমকাল
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪

সাক্ষাৎকার: অজয় দাশগুপ্ত

অর্থনৈতিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে প্রয়োজন সরকারি উদ্যোগ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

মোস্তাফিজুর রহমান

টানা সহিংস রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে অর্থনীতিতে যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে হলে নতুন সরকারকে যেমন একদিকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে, অন্যদিকে থাকতে হবে স্থিতিশীল রাজনীতির নিশ্চয়তা। এ দুইয়ের সমন্বয়ে অর্থনীতিকে আবার তার আগের গতিতে দ্রুত ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব বলে মনে করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মোস্তাফিজুর রহমান। তার মতে অর্থনীতি গত কয়েক মাসে যথেষ্ট চাপের মধ্য দিয়ে গিয়েছে; সহিংসতার কারণে ঝুঁকি বেড়েছে, সংকুচিত হয়েছে বিনিয়োগে, শ্লথ হয়েছে প্রবৃদ্ধি। পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছিল, বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হচ্ছিল, ব্যাংকগুলোতে উদ্বৃত্ত তারল্য বাড়ছিল, প্রাক্কলন অনুযায়ী বেসরকারি খাতের বিনিয়োগে প্রবৃদ্ধি হচ্ছিল না। বেসরকারি খাতের মেয়াদি ঋণের একটি অংশ কুঋণ হয়ে পড়েছে। ভোক্তা, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক ও উৎপাদনকারী – প্রতিটি পর্যায়ে এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। চলতি অর্থবছরের পরবর্তী পাঁচ মাসে হয়তো পূর্ণ অর্থবছরের প্রাক্কলিত সূচকগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে না, তবে কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব। সংবাদের সঙ্গে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে ড. মোস্তাফিজুর রহমান এসব কথা বলেন।

রানা প্লাজার মর্মান্তিক দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপটে ও সহিংস রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে রপ্তানির যে ক্ষতি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে ছোট, মাঝারি ও বড় উদ্যোক্তা সবাইকে প্রয়োজনমাফিক সহায়তা দিতে হবে। রপ্তানিকারকদের স্বার্থে সরকার ইতিমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন। যেমন, উৎসে কর যা আগে ০.৮ শতাংশ ছিল, তা কমিয়ে ০.৩

শতাংশ করা হয়েছে; নতুন বাজার অনুসন্ধানের জন্য যে প্রণদোনা ৩ শতাংশ দেওয়া হতো, তা বৃদ্ধি করে ৪ শতাংশ করা হয়েছে। ঋণ সুবিধার ক্ষেত্রেও কিছু সমন্বয় ও ছাড় দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা চলছে। এক্ষেত্রে দেখতে হবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তরাও যেন সমান সুযোগ পেতে পারেন, বঞ্চিত না হন।

বিনিয়োগকে চাঙ্গা করার জন্য সহায়ক মুদ্রানীতি নিতে হবে; বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখতে হবে; মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে; বিনিয়োগ ও রপ্তানি প্রণোদনার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। অনিশ্চয়তার স্বল্পমেয়াদি ক্ষতি হলে তা কাটানো সম্ভব; তবে মধ্য-দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি যেটা হয়েছে তার একটা বিলম্বিত নেতিবাচক প্রভাব অর্থনীতিতে থেকেই যাবে। এ কথাটি সম্ভাব্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও সমাধিক প্রযোজ্য।

টানা সহিংস রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকের কার্যাদেশ বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলোর কাছে চলে গেছে বলে বলা হচ্ছে। এটা আবার কীভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব? এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অস্থিতিশীলতার কারণে কার্যাদেশ বড় আকারে বাইরে চলে গেছে, এমন কোনো তথ্য নেই। তবে যেটা হয়েছে তা হলো, ক্রেতারা উদ্যোক্তা ও সরবরাহকারীদের সতর্ক করে দিয়েছে যে সহিংসতা চলতে থাকলে তারা হয়তো চলে যাবেন না, তবে ক্রমান্বয়ে ঝুঁকি হ্রাস করবেন। অস্থিতিশীলতা চলতে থাকলে ক্রেতা তার রপ্তানি আদেশ কমিয়ে নিয়ে আসবেন। হরতাল-অবরোধের কারণে উৎপাদন ও পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদক ও রপ্তানিকারক প্রতিযোগিতা সক্ষমতার দিক থেকে দুর্বল হয়েছেন। তাদের মুনাফার ওপর বাড়তি চাপ পড়েছে। ফলশ্রুতিতে, কাঙ্ক্ষিত রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখা কঠিন হবে। তিনি বলেন, এ অর্থবছরের জন্য রপ্তানি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা আছে ১২.৯ শতাংশ। প্রথম কয়েক মাসের প্রবৃদ্ধি ভালো – পরবর্তী মাসগুলোতে এ পর্যায়ে না হলেও কাছাকাছি অঙ্কের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সচেষ্ট হতে হবে। তবে এর জন্য দরকার হবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার।

অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালক হচ্ছে কৃষি খাত। বিভিন্ন মহল থেকে বলা হচ্ছে, হরতাল-অবরোধের কারণে কৃষিতে সরবরাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে – এ বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন? সংবাদের এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দেশের প্রধান ফসল হচ্ছে বোরো ধান। এ ফসলের জন্য যে ধরনের সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন – যেমন সার, বীজ, সেচ – সেগুলো প্রয়োজনমাফিক ও সময়মতো যোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হয়েছে; বীজতলা সময়মতো প্রস্তুত করা যায়নি। উৎপাদন ও খাদ্য

নিরাপত্তা যাতে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য বোরো চাষে সময়মতো উপকরণ ও সহায়তা প্রদান করতে হবে, এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সাহায্য করতে হবে।

দেশে খাদ্য মজুদের পরিমাণ নয় লাখ টনে নেমে এসেছে। হরতাল-অবরোধ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে এদিকটিতে যথাযথ নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি। ড. মোস্তাফিজুর রহমান খাদ্য নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় আমদানি কার্যক্রম গ্রহণ ও সরকারের খাদ্যশস্য ক্রয় পরিকল্পনায় যথাযথ পরিবর্তন আনতে পরামর্শ দেন।

দৈনিক সংবাদ
২০ জানুয়ারি ২০১৪

সাক্ষাৎকার: জাফর আহমদ

প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন রাজনৈতিক পরিবেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কতটুকু সম্ভব?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত সংকট অর্থনীতিকে যেভাবে পেঁচিয়ে ধরেছে, তা আশঙ্কাজনক। সাধারণভাবে সুস্থ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনীতি-অর্থনীতি একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন রাজনৈতিক কাঠামোয় অর্থনীতি বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে। রাজনীতি-অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক কীভাবে নির্ধারিত হয়, সে সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে প্রবন্ধকারের কিছু ধারণার জন্ম হয়েছে। এ নিবন্ধে সেই সম্পর্কের আলোকে আসন্ন সংসদ নির্বাচনোত্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন রাজনৈতিক পরিবেশে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছি।

গবেষণায় দেখা যায়, বিভিন্ন দেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন রাজনৈতিক পরিবেশে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। প্রশ্ন উঠতে পারে – বাংলাদেশের মতো উদীয়মান গণতান্ত্রিক দেশ যেখানে গণতন্ত্রের ভিত্তিই এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেখানে এ আলোচনা কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ? এক কথায় উত্তর হলো এ ধরনের আলোচনার তাৎপর্য রয়েছে। নব্বই দশক থেকে দেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকারের শাসন ক্ষমতায় অবস্থান, কম-বেশি গণতান্ত্রিক চর্চা বজায় থাকা এবং দু-একটি ছাড়া জাতীয় নির্বাচনগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধিতে, সহায়ক বিনিয়োগ পরিবেশ বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। আসন্ন সংসদ নির্বাচনোত্তরকালে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিবেশের বিপরীতমুখী অবস্থা সৃষ্টি

হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হতে পারে, যা বর্তমান নিবন্ধের আলোচনার যৌক্তিকতাকে তুলে ধরে।

গবেষণায় দেখা গেছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভেতরে পরিচালিত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্থনৈতিক নীতি-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা ও জ্ঞান সংযোজন করে, বিকল্প কৌশল সম্পর্কে অবহিত করে, নীতি-পরিকল্পনার দুর্বলতাগুলো ধরিয়ে দেয় এবং অনেক সময় যৌথ উদ্যোগে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। রাজনৈতিক কার্যক্রমে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ সহজতর হলে জনগণের যৌক্তিক দাবিগুলো সম্মিলিতভাবে জোরালো আকারে উঠে আসে। শাসন ক্ষমতায় অবস্থানকারী রাজনৈতিক দলের পক্ষে সেসব দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে সঠিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক পরিবেশে রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতিনিয়ত জনগণের মুখোমুখি হতে হয়। এতে জনপ্রতিনিধিরা চাপের মধ্যে থাকেন। এ ধরনের চাপের কারণে অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধিরা এক ধরনের দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়েন। সার্বিকভাবে একটি দেশে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহত থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কল্যাণকর অর্থনীতি-রাজনীতির ধনাত্মক মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এতে অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হয়।

অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন রাজনৈতিক পরিবেশে জনগণের চাওয়া-পাওয়া মূল্যহীন হয়ে পড়ে। জনগণের গণতান্ত্রিক দাবি অর্থনৈতিক নীতি কাঠামোয় ক্রমশ অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। যা থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জরুরি অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সরকারে অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল কম প্রতিক্রিয়া দেখায় অথবা পর্যাপ্ত মাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখাতে ব্যর্থ হয়। নব্য গণতান্ত্রিক দেশে এ সময়ে রাজনীতি-অর্থনীতির মধ্যকার সম্পর্ক তৈরির সুযোগই সৃষ্টি হয় না। অপেক্ষাকৃত অগ্রসরমান গণতান্ত্রিক দেশে রাজনীতি ও অর্থনীতির যতটুকু মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকে। গবেষণায় দেখা, প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশে রাজনীতি-অর্থনীতির মধ্যকার সম্পর্ক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে; অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ শ্লথ হয়ে পড়ে; উন্নয়ন কার্যক্রম গতিহীন হয়ে পড়ে। ফলে প্রবৃদ্ধির গতি মন্থর হয়ে পড়ে; ফলে কোনো কোনো দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে রাজনৈতিক সরকারের

দায়বদ্ধতা থাকে না। এ পরিস্থিতিতে সরকারের অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নে জনগণের সমর্থন থাকে না।

রাজনীতি-অর্থনীতির মধ্যকার উপরোক্ত সম্পর্ক বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে, নিকট ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির সঙ্গে, এমনকি আরও দূরবর্তী ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সুযোগ রয়েছে। আগামী সংসদ নির্বাচনোত্তরকালে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে – সে পরিস্থিতিতে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

বিদ্যমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সব রাজনৈতিক দলের এবং জনগণের সমান অংশগ্রহণ অনেকাংশেই নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে ন্যূনতম পরিবেশ বজায় রাখা প্রয়োজন ছিল, তা বর্তমানে নেই। ফলে রাজনীতি-অর্থনীতির প্রত্যাশিত ধনাত্মক মিথস্ক্রিয়া এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তার প্রভাব এখনো বহুলাংশে অনুপস্থিত। আশানুরূপ পরিস্থিতি না হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতামুখর ন্যূনতম যে রাজনৈতিক পরিবেশ নির্বাচনকালে নিশ্চিত ছিল – এবারের সংসদ নির্বাচনে তাও অবশিষ্ট থাকল না। ফলে দেশের অর্থনীতি আগামী দিনে নির্দেশিত হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন রাজনৈতিক কাঠামোর ভেতর অবস্থিত সরকারের মাধ্যমে।

এ ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আগামী বছরগুলোয় দেশে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক নীতিমালা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাস্তবায়ন মোটেই সহজসাধ্য হবে না। কারণ, জনগণের অংশগ্রহণমূলক অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়ন কাঠামো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হবে না। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থানের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রম চালানো, দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো ধরে রাখা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের চাহিদার নিরীখে কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি অনুপস্থিত থাকতে পারে। ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বাভাবিক গতিধারা হারিয়ে যেতে পারে।

এ ধরনের রাজনৈতিক সরকার কাঠামো দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক না হয়ে দায় হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। সরকারের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আহরণ সম্ভব নাও হতে পারে; বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে যে পরিমাণ অর্থের যোগান প্রয়োজন হবে তা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা কষ্টকর হবে। বৈদেশিক সহায়তা পাওয়া ও এর

সদ্বব্যবহার করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে উঠতে পারে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এসব রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এ ধরনের সরকারের পক্ষে মোকাবেলা করা দুরূহ। সর্বোপরি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুপস্থিতিতে রাজনীতি-অর্থনীতির ধনাত্মক মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়া পিছিয়ে যেতে পারে। এ মুহূর্তে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

মঙ্গলবার্তা, বণিক বার্তা বিশেষ সংখ্যা
১ জানুয়ারি ২০১৪

গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার সংশয়ে বিনিয়োগ বাড়েনি

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দশম সংসদ নির্বাচনের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি আপাত স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা নিয়ে সংশয় থাকায় ২০১৪ সালে বড় ধরনের কোনো বিনিয়োগ হয়নি। এমনটাই মনে করেন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। গতকাল আমাদের সময়ের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা খুবই জরুরি। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে পারলেই অর্থনীতির চাকা সচল রাখা সম্ভব। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোকে বুঝতে হবে, গতানুগতিক হরতাল কর্মসূচি কেবল অর্থনীতিকেই বাধাগ্রস্ত করছে না, মানুষের জন্য বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে বিবেচনায় দলগুলোকে বিকল্প কর্মসূচি নিয়ে ভাবতে হবে। তার মতে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকলে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম-আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া না গেলেও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব।

তিনি বলেন, ২০১৪ সালে বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্য কম ছিল। এটা আমাদের মতো আমদানি-নির্ভর দেশের জন্য স্বস্তিদায়ক। মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে। সুদ হারও কমেছে। খাদ্য নিরাপত্তাও খারাপ ছিল না। তবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, গ্যাস, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শিল্প স্থাপনের জমির সমস্যা থেকেই গেছে। তাই ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ তেমন বাড়েনি। সুদের উচ্চহার বিনিয়োগের প্রতিযোগিতার সমতাকে কমিয়ে দিচ্ছে। প্রশাসনিক সংস্কার না হওয়ায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এখনো বেশ জোরদার। তাই ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে এখনো অস্বস্তি কাটেনি।

আমদানির আড়ালে অর্থপাচার হচ্ছে বলে মনে করেন বিশিষ্ট এই অর্থনীতিবিদ। তিনি বলেন, আমদানির পরিমাণ বেশি দেখিয়ে অর্থপাচার ও কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। সম্প্রতি অর্থপাচার এত বাড়ছে যে, তা বাংলাদেশের পাওয়া বৈদেশিক সাহায্যের চেয়েও বেশি। তার মতে, রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়লে অর্থপাচারও বাড়ে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে শ্লথ করে দেয়, কমিয়ে দেয় কর আহরণের পরিমাণ। এছাড়া গত চার-পাঁচ মাস ধরে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশ কম। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ব্যাংকিং খাতে দুরাচার বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করছে। এ অবস্থায় নতুন বছরে আমাদের আশা হবে, কর এবং ব্যাংক ঋণ আদায় পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটবে। বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশ থেকে অর্থপাচার রোধ করতে হবে। বাণিজ্যিক জ্বালানির সরবরাহ বাড়িয়ে অবকাঠামোসহ বিনিয়োগের অন্যান্য বাধা দূর করতে হবে।

আমাদের সময়
৩১ ডিসেম্বর ২০১৪

উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য কাঙ্ক্ষিত সক্ষমতা

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
কিশোর কুমার বসাক

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা কি থমকে আছে? কয়েক বছর ৬ শতাংশের উপর প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া কি সীমিত সক্ষমতাকে ইঙ্গিত করে? সম্ভবত বিষয়টি এ রকমই। চলতি বছর বিশ্ব প্রতিযোগিতা সক্ষমতা প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯তম (১৪৪টি দেশের মধ্যে)। গত বছর এ অবস্থান ছিল ১১০তম (১৪৮টি দেশের মধ্যে)। বাংলাদেশ ১০০-এর নিচে অবস্থানকারী দেশের তালিকা থেকে বের হতে পারছে না। আরও স্পষ্ট করে বললে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন খুব দৃশ্যমান নয়। প্রায়ই বিভিন্ন সূচকে অগ্রগতির কথা শোনা যায়, কিন্তু সার্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জনে এর ইতিবাচক প্রভাব সামান্যই। কারণ বাংলাদেশ মৌলভিত্তির সূচকগুলোয় যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি অর্জন করতে পারছে না।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির মৌলভিত্তির সূচকগুলোয় দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নয়। এ সূচকগুলো হলো – প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি, অবকাঠামোগত প্রস্তুতি, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি, অবকাঠামোগত প্রস্তুতি এবং স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলাদেশের অবস্থান একেবারে নিচের সারির দেশগুলোর কাছাকাছি। এ অবস্থানগুলো হলো – যথাক্রমে ১৩১তম, ১২৭তম ও ১০২তম। তবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় বাংলাদেশের অবস্থান যথেষ্ট ভালো (৭২তম)। কিন্তু এককভাবে সামষ্টিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চক্রে গতি বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয়।

অর্থনৈতিক উৎকর্ষ-সম্পর্কিত কোনো কোনো সূচকে বাংলাদেশ ভালো করছে। এগুলোর মধ্যে পণ্যবাজারের দক্ষতা, আর্থিক খাতের উৎকর্ষতা, বাজারের আকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি মধ্যম মানের। উৎকর্ষের অন্যান্য সূচকে বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে রয়েছে; যেমন – প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি, উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও শ্রমবাজারের দক্ষতা ইত্যাদি। মৌলভিত্তির সূচকের দুর্বল অবস্থানের জন্য অর্থনৈতিক উৎকর্ষ-সম্পর্কিত কোনো কোনো সূচকের ভালো অবস্থান প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধিসহ কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনে সহায়তা করতে পারছে না।

অবকাঠামোগত দুর্বলতা: অপর্যাপ্ত অবকাঠামো বাংলাদেশের অনুকূল ব্যবসা পরিবেশের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় বলে ব্যবসায়ীরা মনে করেন। উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ীরা বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে উন্নতি দুর্বল হলেও গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করছেন। তবে অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধার ক্ষেত্রে সমান অগ্রগতি প্রতিফলিত হয়নি। সড়ক যোগাযোগ খাতে সীমিত অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু রেল যোগাযোগ, আকাশপথে যোগাযোগ, বন্দরের সুবিধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রগতি সামান্যই। সার্বিকভাবে ৭৯ শতাংশ উত্তরদাতা অবকাঠামোগত প্রস্তুতি বেশ খারাপ পর্যায়ে রয়েছে বলে মনে করেন। একই সঙ্গে শিল্প-কারখানায় অপর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ, শিল্প স্থাপনের জন্য জমি সংকট এবং জমির উচ্চমূল্যকে তারা সহায়ক বিনিয়োগ পরিবেশের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে দেখছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা: সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও বিভিন্ন নীতিমালা বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে উদ্যোক্তারা হতাশ। ৮৫ শতাংশের অধিক উত্তরদাতা প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। উদ্যোক্তারা মনে করেন, ব্যবসায়িক কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল; সংস্কার কার্যক্রমে রয়েছে ধীরগতি এবং যথেষ্ট ফলদায়ক সরকারি ব্যয় কাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। কয়েক বছর ধরেই প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম নিয়ে উদ্যোক্তাদের মতামত নিম্নমুখী। ৮০-৯০ শতাংশ উদ্যোক্তাই মনে করেন, ব্যবসায়িক প্রতিটি কাজে, যেমন – কর প্রদান, আমদানি-রপ্তানি, গ্যাস-পানি-বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে শুরু করে সরকারি ঠিকাদারিতে অনৈতিক লেনদেন রয়েছে এবং তা কমছে না। আর্থিক খাতের সক্ষমতা আন্তর্জাতিক মানের নয় বলে মন্তব্য করেছেন ৫৬ শতাংশ উত্তরদাতা। তবে আর্থিক বাজারে ভিন্ন ভিন্ন পণ্য ও সেবা নিয়ে আসছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো বলেই মনে করেন উদ্যোক্তারা। কিন্তু আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদন এবং আয়-ব্যয়ের বিবরণের মান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দুর্বল।

শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতের দুর্বলতা: বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা একটি প্রতিযোগীসক্ষম অর্থনীতির প্রয়োজনের নিরীখে বেশ পিছিয়ে রয়েছে। উদ্যোক্তারা মনে করেন, দেশের

শিক্ষিত প্রতিভাবান দক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য দেশে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। ফলে তারা বিদেশে চলে যাচ্ছেন। একই রকম সংকট রয়েছে দক্ষ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীর, যাদের শিল্প, গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যাপকভাবে প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণিত-বিজ্ঞানচর্চার অভাব এবং ব্যবসা ব্যবস্থাপনা শিক্ষার অপ্রতুলতা নিয়ে মতামত দিয়েছেন উদ্যোক্তারা। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যে ধরনের স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকে, তা নিম্নমানের বলে ৭৭ শতাংশ উত্তরদাতা মন্তব্য করেছেন। এখনো ভালো স্বাস্থ্যসেবা উঁচু শ্রেণীর নাগরিকদের কাছেই সহজলভ্য। দেশে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে – আগামী পাঁচ বছরে হৃদরোগ ও ডায়বেটিসের প্রকটতা বাড়বে, যা দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠীর প্রাপ্যতা ও ব্যবহারের সুযোগ সীমিত করবে।

বিশ্ব সক্ষমতা প্রতিবেদন থেকে প্রতীয়মান হয়, কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা সক্ষমতার একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। একই চিত্র দেখা যায় প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের কাছে ওঠা-নামা থেকে। সম্ভবত প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ক্ষেত্রে নিচের দিকে টেনে ধরছে। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধিকে ৬ শতাংশের বৃত্তের বাইরে নিতে হলে প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় দেশকে প্রথম ৮০টি দেশের মধ্যে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী সংস্কারে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং তা বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ দরকার।

সরকারি সেবায় সংস্কার: সরকারি সেবা প্রদানে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, স্বল্পতম সময়ে আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদান নিশ্চিত করা, আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতা দূর করা, সাপ্লাই চেইন ও বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য সহায়ক উন্নয়নে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, একই সঙ্গে সরকারি ব্যয়ের সদ্ব্যবহার এবং প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ বিশেষত বিনিয়োগ বোর্ডের পুনর্গঠন জরুরি।

প্রশাসনিক সংস্কার: সরকারি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি দমনে রাজনৈতিক অঙ্গীকার, দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) শক্তিশালী করা, স্বল্পতম সময়ে আইনি ও প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি জরুরি।

করপোরেট ব্যবস্থাপনায় সংস্কার: করপোরেট ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা, আর্থিক প্রতিবেদন আইনের খসড়া চূড়ান্ত এবং তা বাস্তবায়ন, শেয়ারবাজারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে উন্নত করার পাশাপাশি শেয়ারবাজারে আইন প্রয়োগে আরও কঠোর হওয়া জরুরি।

আর্থিক ব্যবস্থার সংস্কার: আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং এ খাতকে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে দ্বৈত নীতিকাঠামো বর্জন করা, সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে উন্নত করে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করা জরুরি।

সামাজিক এবং পরিবেশগত সংস্কার: পরিবেশ আইনের উন্নতি সাধনসহ এর যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সার্বিকভাবে উদ্যোক্তারা দেশের ব্যবসা পরিবেশ ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে আশাবাদী। তবে একটি কার্যকর ভিত্তি কাঠামোর প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজনীয়তা সবাই স্বীকার করেছেন। বর্তমানে সরকারি-ব্যবসায়ী কোনো ফোরাম না থাকার কারণে ব্যবসায়ীদের সমস্যা সমাধান অনেকটা একরৈখিকভাবে সরকারি সিদ্ধান্তে বাস্তবায়নের চেষ্টা হচ্ছে। অথচ একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম, যেমন – প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে ‘বেটার বিজনেস ফোরাম’-এর মতো আরেকটি ফোরাম সে চাহিদা পূরণ করতে পারে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে সরকার ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারে। একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজের কাঠামো নিয়ে আরও স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারে।

বণিক বার্তা
২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪

তিন বড় চ্যালেঞ্জে নতুন সরকার

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দেশের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে খ্যাত বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, তিনটি বড় চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে নতুন সরকার। এগুলো হলো প্রথমত, সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করা। দ্বিতীয়ত, পুনর্জীবনী কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনীতিকে সচল করা। আর তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক শক্তির কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো।

গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনের সঙ্গে আলাপকালে সমাজসচেতন এই বিশ্লেষক আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব প্রতিক্রিয়া এসেছে তার কূটনৈতিক ব্যাখ্যা করলে এটা পরিষ্কার তারা নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে আরেকটা নির্বাচন চাইছে। এ বক্তব্যগুলো বিদেশের যেকোনো নাগরিক কিন্তু দিচ্ছে না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রশাসন থেকে বলা হচ্ছে। এটা দেশ হিসেবে আমাদের সবলতা নাকি দুর্বলতার লক্ষণ?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের রাজনৈতিক সংকট অর্থনৈতিক সংকটে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। যদি দ্রুত রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটে, তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি মধ্যমেয়াদি সংকটে ঢুকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়ে গেছে। উৎপাদক পর্যায়ে বড় ধরনের ক্ষতির মুখোমুখি করছে। গত দুই বছরের বিনিয়োগ পতনের ধারাকে আরও জোরদার করছে। এর ফলে পর পর তৃতীয়বারের মতো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারের পতন ঘটতে যাচ্ছে। একই সঙ্গে তিন দশকের এক শতাংশ

হারে প্রবৃদ্ধি বাড়ার ধারা থেকে দেশ বিচ্যুত হতে পারে। এই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বলেন, বর্তমানে সামষ্টিক অর্থনীতির সবচেয়ে দুর্বলতম বিষয় হলো বিনিয়োগ হারের পতন। বিশেষ করে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ। গত দুই বছর সরকারি বিনিয়োগ দিয়ে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের কমতিকে কিছুটা পুষিয়ে নেওয়া গেছে। অর্থাৎ ব্যক্তি খাতে পতন হলেও সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় মোট বিনিয়োগ মোটামুটি আগের বছরের সমান ছিল। কিন্তু এ বছর ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ এবং সরকারি খাতের বিনিয়োগ উভয়ই নিম্নমুখী হয়ে গেছে। তাই এবার মোট বিনিয়োগে হারের পতন ঘটতে পারে। তার মতে, বেসরকারি খাতে যে বিনিয়োগ কমে গেছে, তার প্রমাণ হলো গত জুনে ব্যক্তি খাতে ঋণপ্রবাহের হার যা ছিল, এখন তা আরও কমে গেছে। শিল্পঋণ বৃদ্ধির হারও ঋণাত্মক। ব্যাংকে উদ্বৃত্ত তারল্য ৮৪ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। তফসিলকৃত মন্দঋণের হারও গত পাঁচ মাসে আরও বেড়ে গেছে। বিনিয়োগ কমে যাওয়ায় আমদানিপ্রবাহে স্থবির অবস্থা বিরাজ করছে। স্থবির আমদানির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বিনিয়োগের ধারাবাহিক পতনে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বড় ভূমিকা রাখছে। অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিবেশে কোনো বড় বিনিয়োগ হয় না।

সরকারি বিনিয়োগ যে এবার কমে যাচ্ছে, তার বড় প্রমাণ হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের হার গত পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে এ বছর সর্বনিম্ন। গত বছরের প্রথম চার মাসে ২০ শতাংশের বিপরীতে তা এখন ১৫ শতাংশের মতো মনে করা হচ্ছে। এডিপি বাস্তবায়নে অর্থায়নের সমস্যা হচ্ছে, সরকারের কর আদায় এ মাস পর্যন্ত ৬ হাজার কোটি টাকা কম। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক এই সাধারণ সম্পাদক বলেন, উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না পাওয়ার আরেকটি কারণ হতে পারে প্রাক্কলিত পরিমাণে বৈদেশিক প্রকল্প সাহায্য না আসা। গত অর্থবছরে প্রথম চার মাসে যেখানে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের উপর নীট বৈদেশিক সাহায্য এসেছিল, এবার সেখানে মাত্র ৮৫ মিলিয়নের মতো এসেছে। একই সাথে উন্নয়ন প্রশাসন স্থবির হয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘে কাজ করা সাবেক এই রাষ্ট্রদূত বলেন, বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগও বাড়ছে না, গত বছরের মতোই আছে। বছর শেষে হয়তো ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আশপাশেই থাকবে। বাংলাদেশ একটি নিরাপদ বৈদেশিক বিনিয়োগস্থল হিসেবে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স আয়ের ধারাবাহিকভাবে পতন ঘটছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে বিদেশে মানুষ যাওয়ার পরিমাণ প্রায় ২১ শতাংশ কমে গেছে। এটা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে রেমিট্যান্সপ্রবাহ আরও দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে। তবে রপ্তানি পরিস্থিতি ভালো আছে। জিএসপি বাতিল ও রানা প্লাজা বিপর্যয় সত্ত্বেও

রপ্তানি ভালো আছে। কিন্তু এ ভালো যে থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। রপ্তানি যেটুকু ভালো আছে, সেটুকু শুধুই তৈরি পোশাক-নির্ভর। আর পোশাকশিল্প বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। পাট, চামড়াজাত পণ্য ও হিমায়িত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এ বছর উন্নতি নেই। তার মতে, কৃষিতে এবার আমন ভালো হয়েছিল। কিন্তু পণ্য চলাচলে সমস্যা হওয়ার কারণে ধানকল ও পাইকারি পর্যায়ে পণ্য আটকে যাচ্ছে। এর ফলে পুরো সরবরাহব্যবস্থায় অসুবিধা হচ্ছে। পরিবহনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ফলে এবং সরবরাহ অনিশ্চিত হওয়ার জন্য পণ্য খুচরা বাজারে আসতে পারছে না। পণ্য সরবরাহ কমে গেলে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাবে।

সিপিডি-র সাবেক এ নির্বাহী পরিচালক বলেন, এবারের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটা সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার সরকার আসলেও তাদের রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা খুবই সংকুচিত। এ সরকারের নৈতিক বৈধতা হবে খুবই সংকীর্ণ। সে ক্ষেত্রে সরকারের অর্থনৈতিক সক্ষমতাও হবে বেশ কম।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৩ জানুয়ারি ২০১৪

রাজনৈতিক অস্থিরতা পোশাকশিল্পের অগ্রগতিতে অন্তরায়

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

দেশের রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বড় খাত পোশাকশিল্প। ৪০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছে বৃহৎ কর্মসংস্থান উৎসও। তবে সাম্প্রতিক কিছু দুর্ঘটনা ও চলমান রাজনৈতিক সংকটে বেকায়দায় থাকা এ খাতের বাজার হারানোর আশঙ্কা করছেন অনেকে। এর মধ্যেও আশার কথা শোনালেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

২০১৩ সালের শুরু থেকেই তৈরি পোশাকশিল্প বেশ ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা আর অন্যটি হলো অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বিভিন্ন সূচকের পরিবর্তন। সব ছাড়িয়ে সাম্প্রতিককালে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। এ প্রসঙ্গে ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, তাজরীন ফ্যাক্টরি ও রানা প্লাজার ঘটনা প্রমাণ করে তৈরি পোশাক খাতে ঘাটতি ও দুর্বলতা রয়েছে এবং সেই দুর্বলতা থেকেই সারা বছর ধরে নানা ঘটনার উত্তাপ ছড়ায়।

ড. মোয়াজ্জেম বলেন, আশার বিষয়, এসব ঘটনার পর এর থেকে বের হয়ে আসার জন্যও বিভিন্ন সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলে অগ্রগতি হয়েছে অনেক। এসবের মধ্যে নিহত শ্রমিকদের প্রধানমন্ত্রীর অনুদান, আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা, শ্রমিকদের জন্য নতুন মজুরি কাঠামো এবং সেটির সমর্থনে বিদেশি ক্রেতাদের এগিয়ে আসা। এছাড়া পরে ক্রেতারা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন।

তিনি বলেন, এগুলো এক ধরনের অগ্রগতি। তবে এসব ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার নেওয়ার ব্যাপারে এক ধরনের শ্লথগতিও লক্ষ করা গেছে।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর দেশের তৈরি পোশাক খাতের ওপর বিশ্বব্যাপী এক ধরনের প্রভাব পড়ে। এর ভিত্তিতে এই খাতের সংস্কারের ব্যাপারে সব পক্ষ এগিয়ে আসে। আর সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে দেশের ভেতরে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। একই সঙ্গে পোশাক খাতের সমস্যা চিহ্নিত করে ধারাবাহিকভাবে সমাধানের জন্য ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের দুটি সংস্থা হয়েছে। এগুলো হলো ইউরোপীয় অ্যাকর্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালায়েন্স। সংগঠন দুটি বিশেষত অগ্নি-বিদ্যুৎ নিরাপত্তা এবং অবকাঠামোগত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানে কাজ শুরু করেছে। এছাড়া তারা দীর্ঘমেয়াদি কাজ করবে।

তিনি বলেন, "এসব দুর্ঘটনার পর আশঙ্কা করা হচ্ছিল তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় হলো, কোনো ধরনের নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়নি এ সময়। কারণ বিশ্বব্যাপী মৌলিক পণ্যের অন্যতম উৎস বাংলাদেশ। ফলে ক্রেতাদের জন্য নতুন করে অন্য দেশ থেকে পোশাক নেওয়া খুব সহজসাধ্য নয় এবং বাংলাদেশের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতাও আছে। তাই আমি আশা করছি, ভবিষ্যতেও রপ্তানির প্রবাহ অব্যাহত থাকবে, যা এখন পর্যন্ত বজায় রয়েছে।"

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, বর্তমানে যে ধরনের কার্যক্রম চলছে, পোশাক কারখানাগুলো দীর্ঘমেয়াদি কমপ্লায়েন্স, শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ এগুলো যদি যথাসময়ে শেষ হয় এবং সেদিকে সব কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হয়, তবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের আরও মানোন্নয়ন ঘটবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে গর্বের সঙ্গে নেতৃত্ব দেবে পোশাক রপ্তানি খাতে।

অগ্রধিকার বাজার সুবিধা (জিএসপি) প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রানা প্লাজার কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জিএসপি স্থগিত হয়েছে। এই জিএসপি স্থগিত করার ব্যাপারে একটি নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। আর এগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ফের এ সুবিধা ফিরে পেতে পারে। এছাড়া ইউরোপেও জিএসপি সুবিধা পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে। এখানেও বর্তমানে গৃহীত উদ্যোগগুলো বিবেচনায় নেওয়া হবে বলে তিনি মনে করেন। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহারের ফলে কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়লেও ইউরোপের বাজারে যদি কোনো কারণে

জিএসপি সুবিধা স্থগিত করা হয়, তাহলে এর নেতিবাচক প্রভাব আমাদের পোশাক খাতে পড়বে।”

রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে তিনি বলেন, ২০১৩ সালে রানা প্লাজার বাইরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি পোশাক খাতকে প্রভাবিত করেছে। হরতাল-অবরোধের কারণে এ খাতের উদ্যোক্তাদের পণ্য রপ্তানিতে বেশ হিমশিম খেতে হয়েছে। জাহাজের পরিবর্তে উড়োজাহাজ পণ্য পরিবহন করতে গিয়ে তাদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

বৈদেশিক সূচকের প্রভাব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশি টাকা ডলারের বিপরীতে শক্তিশালী হওয়া এবং একই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অন্য রপ্তানিকারক দেশগুলোর মুদ্রা ডলারের বিপরীতে দুর্বল হয়েছে বা অবমূল্যায়িত হয়েছে। এই বিপরীতমুখী পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশি রপ্তানিমুখী পণ্য কিছুটা চাপের মধ্যে পড়েছে।

পাকিস্তানকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) জিএসপি সুবিধা দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইইউ পাকিস্তানকে যে জিএসপি সুবিধা দিয়েছে, সেটা জানুয়ারিতে কার্যকর হয়েছে। এই সুবিধার মাধ্যমে পাকিস্তান স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) মতো ৭৫টি পণ্যে শূন্য শুল্ক সুবিধা পাবে। তবে আশার কথা, এসবের মধ্যে তৈরি পোশাক খাত নেই। অন্য পণ্যগুলোর মধ্যে তৈরি পোশাক খাতের নিট ও ওভেন রয়েছে। ফলে সেখানে বিশেষ কিছু সুবিধা পেতে পারে পাকিস্তান।

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, নতুন মজুরি কাঠামো হয়েছে। সাম্প্রতিক রাজনীতির বাধা-বিপত্তি না থাকলে মালিকদের মজুরি সমন্বয় নিয়ে মাথাব্যথা কেটে যাবে। কারণ ক্রেতারা পণ্যের মূল্য বাড়ানোর ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অনেক ক্রেতা তাদের পণ্যের দামও বাড়িয়েছে। তিনি বলেন, “বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জগুলো না থাকলে, বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতা না থাকলে এই খাতকে তেমন একটা চাপে পড়তে হতো না। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা আর রানা প্লাজা ধসের ঘটনা আমাদের রপ্তানি পণ্যের অনুকূল পরিবেশকে কিছুটা হলেও বিঘ্নিত করেছে।”

পোশাক খাতের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি বলেন, “আগামী দিনে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এটি হবে দীর্ঘমেয়াদি। এ খাতের উন্নয়নে ইতিমধ্যে নেওয়া উদ্যোগগুলো আমাদের পোশাক খাতকে সুবিধাজনক অবস্থায় নিয়ে যাবে। এটাকে ব্যবহার করে আমরা কম দামি পোশাক তৈরি থেকে মধ্য ও উচ্চমূল্যের

পোশাক রপ্তানির দিকে স্থানান্তরিত হতে পারব। আমাদের সুযোগের কোনো সমস্যা নেই। কারণ আমদের উদ্যোক্তারা পরিশ্রমী। তাদের রয়েছে দৃঢ় প্রত্যয়।" তিনি বলেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা কেটে গেলেই আবার এগিয়ে যাবে সম্ভাবনাময় পোশাক শিল্প।

আয় ব্যয় পাতা, কালের কণ্ঠ
১২ জানুয়ারি ২০১৪

সাক্ষাৎকারঃ এম সায়েম টিপু

অধ্যায় ২

অর্থনৈতিক প্রবণতা ও জাতীয় বাজেট ২০১৫

কর আদায় বাড়াতে হবে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে আগামী ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের কাজ চলছে। দেশের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে খ্যাত বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নেই চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বাজেট সংশোধন করতে হবে। ইতিমধ্যে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা কাটছাঁট করার চিন্তাভাবনা চলছে। সম্পদ লভ্যতার নিরীখে ব্যয় কমাতে হবে। ব্যয় কাঠামোর সমন্বয় করতে হবে। এছাড়া উন্নয়ন ব্যয় রক্ষা করতে কর আহরণ ও বৈদেশিক সাহায্য বাড়াতে হবে। এগুলো বাস্তবায়নের পর আগামী অর্থবছরের বাজেট নিয়ে কথা বলা যাবে। আগামী অর্থবছরের বাজেট নিয়ে ইতিমধ্যে সিপিডি কাজ শুরু করেছে বলেও জানান তিনি।

বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, বিশেষ করে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ। আমাদের রাজনৈতিক সংকট অর্থনৈতিক সংকটে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। যদি দ্রুত রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটে, তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি মধ্যমেয়াদি সংকটে ঢুকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অনিশ্চয়তা দূর করতে না পারলে বিনিয়োগ বাড়বে না। পুরোপুরি স্থিতিশীলতা ফিরলেই কেবল বিনিয়োগ বাড়বে। বিনিয়োগের সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

আমাদের সময়
২২ জানুয়ারি ২০১৪

এবারের বাজেট: কী চাই, কেন চাই

ফাহমিদা খাতুন

আজ জাতীয় সংসদে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করা হবে। বর্তমান সরকারের শাসনামলে এ বছর নির্বাচনের পর এটি তাদের প্রথম বাজেট। সেদিক থেকে হয়তো অনেকেই তাকিয়ে রয়েছেন বাজেটে কী থাকছে। তবে বাজেটের আকার, আয়-ব্যয়, খাতভিত্তিক প্রাধান্য, এমনকি বিভিন্ন পণ্য ও সেবার ওপর কী হারে কর আরোপ করা হবে সে রকম অনেক তথ্য আমরা ইতিমধ্যেই গণমাধ্যম থেকে জানতে পেরেছি। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের চাইতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটের আকার শতকরা ১৬ ভাগ বড় হবে এবং এর পরিমাণ হবে ২,৫০,৫১০ কোটি টাকা। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলোর মধ্যে অবকাঠামো অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

আসন্ন বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা হচ্ছে। আর্থিক কাঠামো এবং বাজেটের বাস্তবায়ন – দুটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিভাত হচ্ছে। যে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটটি প্রণীত হয়েছে সেটির মূল লক্ষ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজস্ব আয় বাড়ানো এবং বাজেট ঘাটতি কম রাখা। তবে বাজেটে লক্ষ্যমাত্রা যাই থাকুক, সুচারুভাবে বাস্তবায়নই বড় কথা। প্রতি অর্থবছরের শেষে বাজেটের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো নিম্নমুখী সামঞ্জস্য বিধান করা একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বাজেটের সরকারি ব্যয়, রাজস্ব আহরণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে যে হিসাব-নিকাশই বাজেটে উপস্থাপন করা হোক না কেন তা এখন অনেকটাই আবেদন হারিয়ে ফেলেছে, যেহেতু অর্থবছরের শেষে এসে সেই সংখ্যাগুলো বদলে যায়। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে অঙ্কের হিসেবে গরমিল হতেই পারে। কিন্তু তার পরিমাণ কতখানি?

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো ক্রমান্বয়ে লক্ষ্যমাত্রা থেকে পিছিয়ে আসার ফলে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে যে লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করা হয় সেগুলোর অর্জনও পেছাতে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। মধ্যম-আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতি ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে শতকরা ৮ এবং তার ওপরে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এখনও আমরা শতকরা ৬ শতাংশের মধ্যে আটকে রয়েছি। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথমভাগে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে উৎপাদন, পরিবহন এবং সেবা খাতের কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ভাগে এসে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধিতে শ্লথগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষ করে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এ প্রেক্ষিতে আমাদের অর্থনীতির যে সমস্ত শক্তির দিকগুলো রয়েছে সেগুলো কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ত্বরণ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। সরকারি বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে বাড়লেও ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে গতি সৃষ্টি হচ্ছে না। অন্যদিকে সরকারি বিনিয়োগের গুণগত মানও সবসময় নিশ্চিত করা যায় না। কেননা অনেক প্রকল্প অর্থনৈতিক বিবেচনায় নেওয়া হয় না। অবকাঠামোগত দুর্বলতা তো রয়েছেই। রাস্তাঘাট, ব্রিজ, গ্যাস ও বিদ্যুতের অপ্রতুলতা এখনো বিরাজমান। কিন্তু বিনিয়োগের জন্য সবচেয়ে বেশি যেটি প্রয়োজন তা হলো বিনিয়োগ করার জন্য আস্থা।

ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে গতিময়তা না থাকার ফলে বর্ধিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশের শ্রমবাজারে প্রতি বছর বিশ লাখ নতুন শ্রমশক্তি প্রবেশ করছে। এই বিশাল শ্রমশক্তিকে শুধু রাষ্ট্রীয় খাতে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করে বিশাল কর্মযজ্ঞ সৃষ্টি। কর্মসংস্থানের অভাব হলে তা একদিকে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করে এবং ব্যক্তি খাতের ভোগ কমে যায়। ফলে তা জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে প্রকারান্তরে ব্যাহত করে। অন্যদিকে বেকারত্বের সংখ্যা না কমালে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব নয়, আয় বৈষম্য ঘুচানো সম্ভব নয়। কর্মহীন, আয়হীন জনগোষ্ঠী হতাশাগ্রস্ত হয়ে অনেক সময় নেতিবাচক কর্মকাণ্ডেও জড়িয়ে পড়ে যা সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট করে। অন্যদিকে এদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীল ও আয়বর্ধক কাজে নিয়ে আসতে হলে প্রচুর বিনিয়োগ দরকার।

তাছাড়া যে সমস্ত সামাজিক সূচক অর্জনের জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চাঙ্গা না থাকলে সেগুলো অর্জনও বাধাগ্রস্ত হবে। মানসম্মত শিক্ষার হার বাড়ানো, শিশুমৃত্যুর হার কমানো, মাতৃমৃত্যু হার কমানো, স্বাস্থ্যসেবার আওতা ও মান বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নেও অবদান রাখবে। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই করতে হলে সামাজিক সূচকগুলোর উন্নয়ন

অপরিহার্য। তদুপরি রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করা। যার জন্য প্রয়োজন অর্থ ও প্রযুক্তি। যদিও এর জন্য উন্নত বিশ্বের দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং অর্থ ও প্রযুক্তি আন্তর্জাতিক উৎস থেকেই আসতে হবে, কিন্তু আমাদের নিজেদেরও পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এসব দিক বিবেচনা করলে বাজেটের সংখ্যা নিয়ে যুক্তিতর্ক করাটা অর্থহীন। কেননা বাজেটে একটি অর্থবছরের যে হিসাব দেওয়া হয় তার আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা। সেটি করতে হলে মানসম্মতভাবে বাজেটের বাস্তবায়ন অপরিহার্য। কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য যদি বাজেটের আকার ছোট রাখতে হয় তাহলে ক্ষতি কি? অভীষ্ট লক্ষ্য যদি হয় সুচারুরূপে বাজেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতিশীলতা বজায় রাখা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, সামাজিক সুরক্ষা সৃষ্টি করা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সামাল দেওয়া – তাহলে বাজেটের মানটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ জুন ২০১৪

রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জন কঠিন হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

প্রস্তাবিত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটের আকার এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বর্তমানে বেশ আলোচনা হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো দেশে ক্রমবর্ধমান চাহিদার বাস্তবতায় বাজেটের আকার বড় হওয়া অস্বাভাবিক নয়; রাজস্ব আহরণের তাগিদও কোন অংশে তাই কম হবার নয়। বিষয় সেটি নয়। কথা হচ্ছে এসব বাস্তব চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কিনা এবং তা বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা আমাদের আছে কিনা। এসবের নিরীখে মনে হয় যে, বাজেটে রাজস্ব আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জন করা বেশ কঠিন হবে, যেমন হবে প্রস্তাবিত বাজেটের বাস্তবায়ন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে সরকারকে।

বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা না গেলে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উদ্যোগ গ্রহণ কার্যত ব্যাহত হয়। বাজেটে আয়-ব্যয়ের বিষয়গুলো এমনভাবে করা হয়েছে, যা বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। চলতি অর্থবছর (২০১৩-১৪) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) মোট রাজস্ব আদায় প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ১২ হাজার থেকে ১৩ হাজার কোটি টাকা কম হতে পারে। এ অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে এনবিআর-কে ২৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। এ বছর দেশের রাজস্ব আদায় এক ধরনের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গেছে। কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ও কম হয়েছে। তার নিরীখে লক্ষ্য অর্জন দুরূহ হবে মনে হয়। আয়করের ওপর এবার গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। এটা সঠিক পদক্ষেপ। প্রত্যক্ষ করের অংশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে হবে। এটি প্রগতিশীল, যা বৈষম্য নিরসন ও বণ্টনে ন্যায্যতা আনতে সাহায্য করবে। কিন্তু এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক

সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, কর ফাঁকি রোধ করতে হবে, প্রয়োজনমাফিক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, আর কর ব্যবস্থাপনায় সুশাসন জোরদার ও নিশ্চিত করতে হবে। সরকার এ ধরনের উদ্যম কতটুকু নিতে প্রস্তুত তা অবশ্য দেখার বিষয়।

বাজেটে ৬৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি ঘাটতি মেটাতে সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ নেওয়ার কথা বলেছে। ঘাটতি মোকাবেলায় বৈদেশিক অনুদান ও সাহায্যের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৪০০ কোটি ডলার; তার অর্থ নীট হিসাবে পেতে হবে ৩০০ কোটি ডলার। বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনোই ৪০০ কোটি ডলার পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায় এ পরিমাণ অর্থপ্রাপ্তি হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। বর্তমানে এক হাজার ৯০০ কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য পাইপলাইনে আছে। এগুলো প্রতিশ্রুত অর্থ। ব্যবহারের হার যদি বাড়ে, তাহলে এই টাকা থেকে বেশি অর্থ পাওয়া যাবে ও প্রয়োজনমতো তা ব্যবহার করা যাবে। তবে অভিজ্ঞতা বলে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যখন ভালো থাকে তখনও পাইপলাইনের মাত্র ১৭-১৮ শতাংশ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করার সক্ষমতা আমরা এ পর্যন্ত দেখাতে পেরেছি – এর বেশি নয়। কিন্তু সরকার বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার যে লক্ষ্য ঠিক করেছে, তা অর্জন করতে হলে পাইপলাইনে থাকা সাহায্যের ২২ শতাংশ পেতে হবে। প্রশাসনে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবায়ন সক্ষমতার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ব্যতিরেকে এটা সম্ভব নয়। আর এটা কোনো এক অর্থবছরের বিষয় নয়। এর জন্য প্রয়োজন হবে ধারাবাহিক প্রচেষ্টার।

ভর্তুকির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কিছু শর্তও সরকারকে মানতে হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের তুলনায় আসছে বাজেটে মোট ভর্তুকি বরাদ্দ কমানো হয়েছে ১৮.২ শতাংশ। প্রস্তাবিত ভর্তুকি ধরা হয়েছে জিডিপির ২ শতাংশ; অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরে এ হার ছিল জিডিপির ২.৭ শতাংশ। কৃষি ভর্তুকি চলতি বছরের মতই নয় হাজার কোটি টাকা ধরা হয়েছে প্রস্তাবিত বাজেটে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম কম থাকায় সরকারের এক্ষেত্রে কিছু সাশ্রয় হবে বলে মনে হয় এবং কৃষি ভর্তুকির জন্য চার হাজার ৬৮০ কোটি টাকার প্রয়োজন হতে পারে।

বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির ৭.৩ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার যৌক্তিকতা নিয়ে যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন রয়েছে। এ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে প্রয়োজন উচ্চতর বিনিয়োগ। সরকারি বিনিয়োগ যদিও জিডিপির অংশ হিসাবে বাড়ছে, কিন্তু ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ প্রত্যাশিত মাত্রার নিচে। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের হার এখন ২১ শতাংশ। ৭.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সেটাকে অন্তত ২৫ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। এ জন্য জিডিপির অংশ হিসাবে ৪-৫ শতাংশ বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এ বিনিয়োগের পরিমাণ হবে টাকার অঙ্কে ৭৫

হাজার কোটি টাকার মত। বিনিয়োগের এ প্রবৃদ্ধি কীভাবে আসবে? বাংলাদেশে এক বছরে ইতিপূর্বে জিডিপির দেড় থেকে দুই শতাংশের বেশি বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি হয়নি। এমন নয় যে, গত বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেই কেবলমাত্র দেশে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ কমেছে। এ প্রবণতার সূত্রপাত হয়েছে ২০১২-১৩ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিক থেকে। কিন্তু ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগকে চাঙ্গা করার জন্য যে ধরনের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও উদ্যম প্রয়োজন তাতে ঘাটতি ছিল। তবে আশা করা যায় সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুফল আগামীতে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে আসবে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকবে কিনা তা নিয়ে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। অর্থমন্ত্রী এ ধারণা নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন যে, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করবে। এ কারণে সিপিডি ধারাবাহিকভাবে সমঝোতামূলক রাজনীতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে আসছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) শৃঙ্খলা না আনা গেলে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের সুফল সাধারণ মানুষ পাবে না। পরিকল্পনা কমিশন ৩০৫টি প্রকল্পকে চলতি অর্থবছরে শেষ করা হবে বলে চিহ্নিত করেছিল; ১১০টি প্রকল্প এ যাবৎ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। আগামী অর্থবছরেও এসব প্রকল্পের কাজ চলবে। এডিপির মোট বরাদ্দের প্রায় অর্ধেকই ৩৫২টি প্রকল্পে দেওয়া হয়েছে। এডিপির প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন হয় ব্যয় বরাদ্দের ভিত্তিতে। কিন্তু এ মূল্যায়ন করা উচিত গুণগত মান ও উৎকর্ষতার বিচারে।

পদ্মা সেতুর কাজ দ্রুত শেষ করাই সরকারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। নিজস্ব অর্থায়নে সেতু নির্মাণ করলে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ পড়বে। এ ছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষিসহ অন্যান্য অগ্রাধিকার খাতে বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে কমে যাবে। এ সরকার বা আগামী সরকারকে অবশ্যই বন্ড ছেড়ে ও পুঁজিবাজার থেকে পদ্মা সেতুর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। একই সঙ্গে বৈদেশিক ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

অর্থমন্ত্রী বাজেট ঘোষণার আগে একবার বললেন, আগামী অর্থবছরে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ থাকছে না। কালো টাকা সাদা করার বিষয়ে অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। বাজেট-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ আর থাকছে না। এর কিছু দিন পর তিনি আবার সুযোগ থাকার কথা বললেন। একদিকে করের আওতা বাড়ানো হবে, করের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনার কথা বলা হবে, অন্যদিকে কালো টাকার মালিকদের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হবে – এটা যুক্তিসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

বাজেটের কর প্রস্তাবে বেশ কিছু ইতিবাচক দিক আছে। করের ক্ষেত্রে প্রণোদনা ও কর বিন্যাসের সুফল ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা যাতে পেতে পারেন তার জন্য সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা, বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বাজেট বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা – এসবের আলোকে পরবর্তীতে এ বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে।

বাজেট বাস্তবায়নে সমঝোতামূলক রাজনৈতিক আবহ তৈরি করতে হবে। অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বিশ্বব্যাংকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে দেশের অন্তত **১** শতাংশ প্রবৃদ্ধি কমে যাচ্ছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। এ জন্য বিনিয়োগকারীদের জন্য আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

সকালের খবর
৮ জুন ২০১৪

বাস্তবসম্মত বাজেটের জন্য চাই গতিশীল অর্থনীতি

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাজেট তো বড় হতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় হলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়তে হবে, বাড়তে হবে আয়ও; সেহেতু বাজেট বড় হওয়াটা বড় বিষয় নয়, বরং বাজেটের অন্তর্নিহিত যে যৌক্তিকতা এবং সেটার তথ্যগত ভিত্তি, সেগুলো ঠিক হওয়াটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মতো দেশে এখনও ১৬ থেকে ১৭ শতাংশের মতো মোট রাষ্ট্রীয় দেশজ ব্যয় আছে; সেটা ২০ শতাংশের উপরে ওঠাটা স্বাভাবিক। বাংলাদেশের যে বিনিয়োগের দাবি, সেটার জন্য এটি খুবই প্রয়োজনীয়। আর সরকার ব্যয় করলে কিছু না কিছু তো উন্নয়ন হবেই। এতে হয়তো দক্ষতার অভাব থাকতে পারে, কিন্তু উন্নয়ন হয়। তা না হলে প্রবৃদ্ধি আসছে কোথা থেকে?

প্রথম কথা হলো, বাজেট বাস্তবসম্মত হতে হবে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বিনিয়োগ, বিশেষ করে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের পতন ঘটেছে। এখনও আমরা এর কোনো উন্নতি লক্ষ করছি না। সে কারণে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ, বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং সরকারের যে বিনিয়োগ, সেটার দক্ষতা বৃদ্ধিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, সরকারের বাজেটের যে আর্থিক কাঠামো, সেটার সংহতি, তার যৌক্তিকতা, তার বাস্তব ভিত্তি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর পুরো জিনিসটাই অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হবে সরকারের সম্পদের লভ্যতার ওপর ভিত্তি করে; বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সে কী পাচ্ছে এবং বৈদেশিক উৎস থেকে যেটা পাবে সেটার যে প্রাক্কলন করা হয়, সেটা কতখানি বস্তুনিষ্ঠভাবে করে থাকে – সেসবের ওপর। সে হিসেবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, আর্থিক কাঠামোর সংহতি এবং সম্পদের লভ্যতা নিশ্চিত করাই মূল বিষয় হয়ে দাঁড়াবে বাজেটের জন্য।

বাজেট একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। রাজনীতিতে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা থাকবেই। রাজনৈতিক দর্শন ছাড়া কোনো বাজেট তৈরি হয় না। যেহেতু সরকার রাজনৈতিক, তাই সরকার যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়, তা বাজেটের ভেতর তো থাকতেই হবে। তাই বাজেটের ভেতর সবসময় রাজনীতি থাকে।

বাজেটের একটা বড় বিষয় হলো নির্বাচনের পরে অর্থনীতির যে গতিশীলতা আমরা আশা করেছিলাম, তা গত তিন মাসে আসেনি। সুতরাং আগামী তিন মাসে কী গতিশীলতা আসে, তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করবে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাজেটকে কতটুকু শক্তিশালীভাবে সরকার সামনে আনতে পারবে। গত অর্থবছরের প্রথম ছয় মাস বিভিন্ন রাজনৈতিক ডামাডোল, ধ্বংসাত্মক কাণ্ড ইত্যাদি গেছে। গত তিন মাসে আপাত শান্তি বিরাজ করলেও আমরা দেখেছি, ঋণপ্রবাহ বাড়েনি, রেমিট্যান্স কমে গেছে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হারও খুব বেশি ত্বরান্বিত হয়নি। আমদানি বৃদ্ধি পেলেও কিছু পুঁজিপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন চোখে পড়েনি; তাই আগামী বাজেটের অনেক কিছু নির্ভর করবে আগামী তিন মাস কেমন করে অর্থনীতি এগোবে। এ তিন মাসে যদি এক ধরনের মোমেন্টাম বা ত্বরণ সৃষ্টি হয়, তাহলে তা বাজেটের জন্য উপকারী হবে। দ্বিতীয় যে সমস্যা বাজেটের তা হলো, বাজেটের বাইরে যেটা রয়েছে অর্থাৎ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আয়তন নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করা দরকার। কিন্তু সমস্যা হলো, এখানে এক হাজারের উপরে প্রকল্প রয়েছে, যেখানে নামেমাত্র বরাদ্দ দেওয়া হয় বিভিন্ন সময়। যেগুলো শেষ হওয়ার কথা রয়েছে, এমনকি শেষ করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে, সেখানেও পর্যাপ্ত অর্থ দেওয়া হয় না। তার পরিবর্তে অননুমোদিত বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প, বিশেষ করে যৌক্তিকতাবিহীন রাজনৈতিক বিবেচনার প্রকল্প বিভিন্নভাবে ঢুকছে। বাজেট আয়তনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু দক্ষতা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব সেভাবে আসছে না। তাই এবারের বাজেটে একটা বড় দায়িত্ব ছিল প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা। চিহ্নিত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলোকে অত্যন্ত সততার সঙ্গে কার্যকর করা। মাঝে মাঝে শেষ করার জন্য অগ্রাধিকার চিহ্নিত হয়, কিন্তু তারপর অর্থ এবং প্রশাসনিক সমর্থন দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ঠিক মতো করা হয় না। তাই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির দিক থেকে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সম্পদের লভ্যতার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো কয়েক বছর ধরে যেভাবে কর আদায় বাড়ছিল, কর আদায়ের সে গতি কিছু দিন হলো শ্লথ হয়ে গেছে। সে গতি আবার আগামী বছর সরকার ফিরিয়ে আনতে পারবে কিনা, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার আমাদের অর্থনীতিতে কমে গেছে অনেক। সুবিধাজনক শর্তে বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করতে না পারলে বাংলাদেশের যে উন্নয়ন

চাহিদা, তা মেটানো কষ্টকর হয়ে পড়বে। কারণ শুধু অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে উন্নয়ন চাহিদা মেটানো খুবই কষ্টকর হবে আমাদের মতো গরিব দেশের জন্য। আর যদি শুধু অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এ চাহিদা মেটাতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন খাতে টান পড়বে। পদ্মা সেতু অবশ্যই আমরা নিজের টাকায় করতে পারি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, নিজের টাকায় করলে অন্য কোনো না কোনো জায়গায় টান পড়বে। যদি নতুন কোনো অর্থের উৎস অভ্যন্তরীণভাবে বা বৈদেশিকভাবে সেটার সঙ্গে যুক্ত না করতে পারি, তাহলে সমস্যা প্রকট হবে। রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে এ মুহূর্তে বড় ধরনের যে দুশ্চিন্তার কারণ, সেটা হলো বিগত সময়কালে সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অনেক ঋণ নিয়েছে। এ ঋণ পরিশোধজনিত ব্যয় এখন প্রায় ২০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে। এত বড় অংশ যদি রাজস্ব ব্যয়ের ঋণ পরিশোধ করতে চলে যায়, তাহলে অন্যান্য উন্নয়ন সমর্থক কাজের জন্য টাকা পাওয়া সরকারের জন্য কষ্টকর হবে। বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় হলো, এখন অনেক বৈদেশিক সাহায্য পাইপলাইনে রয়েছে। সেগুলোকে প্রকল্প ব্যয়ের ক্ষেত্রে কী কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তা এক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হবে। শেষ যেটা হলো, এ সব কিছু করার জন্য সরকারের দরকার ছিল উন্নয়ন প্রশাসনের কিছু মৌলিক সংস্কার। সরকারি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট যে সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট, সেটা পাস হলো না, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ কার্যকর করতে পারল না এখন পর্যন্ত, স্থানীয় সরকারের কাছে বিকেন্দ্রায়ন হলো না এখন পর্যন্ত। ভেতরের অভ্যন্তরীণ যে সমন্বয় আর্থিক খাতকে কেন্দ্র করে, বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতে এ মুহূর্তে যে বিপর্যয় হয়েছে, সেটার জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার না করে শুধু অর্থ বরাদ্দ দিয়ে এর কার্যকর ব্যবহার বা দক্ষতা নিশ্চিত করা যাবে না।

আলোকিত বাংলাদেশ
১১ মে ২০১৪

ব্যক্তি খাতের আস্থাহীনতা কাটাতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

নির্বাচনের আগে টানা রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বাভাবিক গতিধারায় বাধা পড়েছে। বিনিয়োগে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে ব্যক্তি খাত বেশ সতর্ক ও সাবধানী। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আগামী বাজেটে সরকারকে এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে ব্যক্তি খাত সরকারের প্রতি আস্থা ফিরে পায়। বিশেষভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে অর্থনীতির গতিশীলতা নষ্ট হবে। অনিশ্চয়তা কাটাতে হলে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে, আর তার জন্য একটা অনুকূল রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টি করতে হবে। এসব বিষয় গুরুত্ব দিয়েই আগামী অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের সুপারিশ করেন তিনি।

আগামী অর্থবছরে সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে অর্থনীতির মূল সামষ্টিক সূচকসমূহ স্থিতিশীল রাখা। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিনিয়োগে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়াতে আর্থিক ও রাজস্ব খাতে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, "বিগত দিনের রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারার স্বাভাবিক গতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থনীতি-বহির্ভূত বিষয়, অথচ অর্থনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে – এমন বিষয়গুলো নজরে আনতে হবে।"

বাজেট প্রণয়নকারীদের সতর্ক করে এ অর্থনীতিবিদ বলেন, "বেসরকারি খাতকে উৎসাহ দিতে গিয়ে বেহিসাবী প্রণোদনা এবং অপরিকল্পিত ভর্তুকি দেওয়া উচিত হবে না। বরং প্রদেয় বিভিন্ন সহায়তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত

সুবিধা প্রদান করতে হবে। রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের সম্প্রসারণ করতে হবে, সম্ভাবনাময় ও কৌশলগত খাতে রাজস্ব ছাড় দিতে হবে। বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়নের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সরকারকে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আর বিনিয়োগ পরিবেশ নির্ভর করবে অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সহায়ক আর্থিক ও রাজস্ব নীতি ও সরকারি বিনিয়োগের উৎকর্ষতার ওপর। তাই গুণগত মানসম্পন্ন বিনিয়োগে গুরুত্ব দিতে হবে।"

পরিকল্পিত বিনিয়োগের রোডম্যাপ প্রণয়নের পরামর্শ দিয়ে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এ রোডম্যাপে রাজস্ব কাঠামো, মুদ্রানীতি, প্রণোদনা কাঠামো ও অবকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। আগামী বাজেটে তৈরি পোশাকশিল্পের প্রি-ফ্রেবিকেটেড কারখানা নির্মাণ যন্ত্রাংশ আমদানির ওপর শুল্ক উঠিয়ে নেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। সাভারে ট্যানারি শিল্প স্থানান্তরের জন্য যে সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা যথাযথ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

জ্বালানি, বিশেষভাবে গ্যাসের অপ্রতুলতার কারণে এবং নিষ্কন্টক জমির অভাবে সমস্যায় আছেন শিল্প উদ্যোক্তারা, বিশেষত নতুন উদ্যোক্তরা। জ্বালানি সমস্যার সমাধানে বিকল্প হিসেবে সরকারকে কয়লার প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক বলেন, একটি পরিবেশবান্ধব ও গ্রহণযোগ্য কয়লানীতি বাংলাদেশের জন্য জরুরি। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় আনতে পারলে দ্রুত শিল্পপার্ক ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (special economic zones) নির্মাণের কাজগুলোকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে। অবকাঠামো নির্মাণ এবং যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে এটা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। বিনিয়োগের জন্য অতি জরুরি এ সংক্রান্ত উদ্যোগ বাস্তবায়নে আগামী বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ রাখতে হবে।

রাজধানীর বাইরে শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহী করতে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, দেশব্যাপী সুষম শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে রাজধানীর বাইরে শিল্প স্থাপনের জন্য বর্তমানে যে প্রণোদনা কাঠামো আছে তা কার্যকর হচ্ছে না। রাজধানীর বাইরে শিল্পপার্ক বা অর্থনৈতিক অঞ্চলে কমমূল্যে শিল্প প্লট বিতরণ, বিদ্যুৎ-গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা, যন্ত্রপাতি আমদানিতে কর ছাড়, স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির সুবিধাসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলে উদ্যোক্তারা ঢাকার বাইরে বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন। বাজেটে এসব বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে প্রণোদনা ও নীতিকাঠামো গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করেন তিনি।

বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, প্রতি বছর গড়ে ১.৪ বিলিয়ন ডলারের মত অর্থ বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। তাই বিদেশে অর্থপাচার রোধে আইনি কাঠামো আরও শক্তিশালী করার পরামর্শ দিয়ে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) অর্থপাচার রোধে আইন প্রয়োগে আরও কঠোর হতে হবে। এনবিআর-এ ট্রান্সফার প্রাইসিং সেল গঠন করা হয়েছে – এটা ভালো। তবে এখানে আরও জনবল দিতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালী করতে হবে ও সেলের কাজের পরিধি বাড়াতে হবে।

আগামী বাজেটে ভর্তুকি যাতে অযৌক্তিকভাবে না বাড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন ড. মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, ভর্তুকির চাপ কম রেখে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করাই হবে আগামী বাজেটের বড় লক্ষ্য। তা ছাড়া আমদানির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহারে সমন্বয় করতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে এর জন্য প্রয়োজনীয় ও সহায়ক শুল্কহার আগামী বাজেটে রাখতে হবে, বিশেষভাবে এ খাতের সুবিধায় টার্নওভার সীমা বৃদ্ধি করতে হবে এবং মূসক নীতি ও সম্পূরক করের যথাযথ সমন্বয় করতে হবে। বর্তমানে যেসব খাতে কর অবকাশ সুবিধা রয়েছে, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অব্যাহত সুবিধা প্রদানের যৌক্তিকতা নির্দিষ্ট করতে হবে। পোলট্রি খাতের মত সম্ভাবনাময় খাতগুলোর জন্য সহায়ক কর প্রণোদনা কাঠামো বিবেচনা করা প্রয়োজন।

প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের সুবিধা নিশ্চিত করতে নানা উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান ড. রহমান। তিনি বলেন, ভালো বীজ, ন্যায্য মূল্য এবং কৃষিঋণের সরবরাহ বাড়াতে পদক্ষেপ নিতে হবে। কৃষি খাতের সাথে শিল্প খাতের সংযোগ বৃদ্ধি করতে হলে যথাযথ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির দিক থেকেও কৃষির গুরত্ব অপরিসীম। গ্রামীণ অর্থনীতির কথা বিবেচনায় রেখে উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিনিয়োগ প্রাধান্য দিতে হবে। কৃষির সার্বিক উন্নয়নে ‘কৃষি কমিশন’ গঠনের সুপারিশ জানান এ অর্থনীতিবিদ।

আগামী বাজেটে বিদেশি ঋণের সরবরাহ বাড়াতে পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, পাইপলাইনে থাকা বিশাল অঙ্কের বৈদেশিক ঋণ ব্যবহারে সরকারকে যথাযথ কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। জমে থাকা এ ঋণ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কারণগুলোকে সনাক্ত করে এ লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বৈদেশিক ঋণ কম ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ উৎস

থেকে ঋণ নিয়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের একটি আগ্রহ সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায়। দেশীয় অর্থে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রেও সমানভাবে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে বৈদেশিক ঋণ ব্যবহারেও আগ্রহ বৃদ্ধি ও সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। বৈদেশিক ঋণের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার একদিকে স্বল্প সুদে প্রাপ্ত অর্থে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেবে, অন্যদিকে বেসরকারি খাতের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণ সূত্র থেকে বিনিয়োগের জন্য অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ বাড়িয়ে দেবে।

তিনি বলেন, এনবিআর এবং এনবিআর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ে এবারও বড় অঙ্কের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এনবিআর-এর জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা এক লাখ ৪৯ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করতে যাচ্ছে সরকার, যা পূরণ করা কঠিন হবে বলে মনে হচ্ছে। করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানোর এবং করপোরেট ট্যাক্স কমানোর কথা শোনা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে যথাযথ হোম-ওয়ার্ক করা প্রয়োজন কারণ এসব পদক্ষেপের অভিঘাত সরাসরি রাজস্ব আদায়ের ওপর পড়বে।

রাজনৈতিক জনপ্রিয়তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাজেট প্রণয়নের প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসার পরামর্শ দিয়ে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অর্থনীতির চাহিদা বিবেচনায় রেখেই আগামী বাজেটে কর কাঠামো, বিনিয়োগ প্রণোদনা, ঘাটতি অর্থায়ন কীভাবে করা হবে, উন্নয়ন ব্যয়ের কাঠামো কী হবে এগুলো নির্ধারণ করা উচিত।

বড় বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা প্রসঙ্গে ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাজেট বাস্তবায়নে নানা কৌশল গ্রহণ করা হলেও তার মধ্যে দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবল, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো, দক্ষতার উৎকর্ষতা, ক্রমবর্ধমান চাহিদাও বাজেটের বাড়তি আকারের সাথে সমান্তরালভাবে বাড়াতে হবে। মিডিয়াম টার্ম বাজেটারী ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় এখন সব মন্ত্রণালয় চলে এসেছে। তাদের বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সক্ষমতার দিকে এখন দৃষ্টি দিতে হবে। এজন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকা উচিত।

এই অর্থনীতিবিদ বলেন, বাজেট বাস্তবায়নের সঙ্গে সরাসরি অর্থনীতির বলয়ের বহির্ভূত অনেক ইস্যু সম্পর্কিত। তিনি স্মরণ করেন, বিগত সময়ে সাংঘর্ষিক রাজনীতি কীভাবে অর্থনীতির চলমান কার্যপ্রবাহকে বিঘ্নিত করেছে, সম্ভাবনাগুলোকে পিছিয়ে দিয়েছে। অনুকূল রাজনীতি ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ না থাকলে বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত

হবে না, প্রবৃদ্ধি শ্লথ হারে হবে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হবে। রাজনীতিবিদগণ এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে আগামী অর্থবছর সময়কালে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কৌশল নির্ধারণ করবেন বলে আশা করেন এ অর্থনীতিবিদ।

আয় ব্যয় পাতা, কালের কণ্ঠ
২৫ মে ২০১৪

সাক্ষাৎকার: ফারজানা লাবনী

বাজেট প্রস্তাব ২০১৪-১৫: মতামত ও সুপারিশ আমলে নিন

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশের পর সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং অন্যান্য মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বাজেটকে বিনিয়োগবান্ধব হিসেবে অভিহিত করেছে। শেয়ারবাজারের জন্য বাজেটে কিছু সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তবে বাজেটের পর প্রথম কর্মদিবসে দুটি স্টক এক্সচেঞ্জেই সূচক কমেছে। বলা যায়, এই বাজারে অর্থমন্ত্রীর পদক্ষেপ নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আমি আশা করব, গত কয়েক দিনে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল থেকে বাজেট বিষয়ে যেসব মতামত ও সুপারিশ রাখা হয়েছে এবং আগামীতে রাখা হবে, অর্থমন্ত্রী বাজেট চূড়ান্ত করার আগে সেগুলো বিবেচনায় নেবেন। জাতীয় সংসদে বাজেট নিয়ে আলোচনা হবে। দেশের সব রাজনৈতিক দল সংসদে নেই। তাদের মতামতও নানাভাবে প্রকাশিত হবে। অর্থমন্ত্রী উদার মনোভাব নিয়ে চললে বিভিন্ন অংশের অভিমত ধারণ করেই আগামী অর্থবছরের বাজেটটি চূড়ান্ত করা সম্ভব।

প্রস্তাবিত বাজেটে আয় ও ব্যয় এবং দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার প্রাক্কলন রয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৭.৩ শতাংশ। অনেকে বলছেন, এ লক্ষ্যমাত্রা উচ্চাভিলাষী। বর্তমান অর্থবছরে ৭.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি। রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি। আবার ব্যয় হয়েছে হিসাবের তুলনায় বেশি। এ অবস্থায় নতুন বছরের লক্ষ্যমাত্রা যেভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, তা পূরণ করার মতো অবকাঠামো রয়েছে কিনা এবং অন্যান্য শর্ত পূরণ হবে কিনা, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সবার মত নিয়ে অর্থমন্ত্রী যদি তার বাজেট প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবমুখী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়, তা হবে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সূত্রে আয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ৪৯ হাজার ৭২০ কোটি টাকা। এ অর্থ আদায়ের জন্য রাজস্ব বোর্ডের অবকাঠামো সুবিধা যথেষ্ট কিনা, সেটা বিবেচনায় রাখা চাই। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করতে অনেক ক্ষেত্রে ছাড় প্রদান করা হয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে কর বাড়ানো হয়েছে। ইতিমধ্যে কেউ কেউ মত দিয়েছেন, নতুন কর আরোপ কিংবা বিদ্যমান কর হার বাড়ানোর সব সুযোগকে অর্থমন্ত্রী কাজে লাগাননি। অন্যদিকে, ব্যয়ের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রস্তাবিত বাজেটে মূলধনজনিত রাজস্ব ব্যয় হিসেবে ২৬ হাজার কোটি টাকার মতো বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে একটি অংশ ব্যয় হবে সরকারি ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি পূরণে। এসব ব্যাংকে পরিচালনার সমস্যা রয়েছে। ব্যবস্থাপনার দক্ষতা-মানও দারুণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। সেসবের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে জনগণের ট্যাক্সের টাকা এ খাতে ব্যয়ের যৌক্তিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হবেই।

আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ক্রমাগত বড় হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে মান নিয়ে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, আমরা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছি, তার তুলনায় কাঙ্ক্ষিত ফল মিলছে না। কোনো কোনো প্রকল্পে নির্ধারিত ফল পেতে অনেক বেশি সময় চলে যাচ্ছে এবং এ কারণেও ব্যয় বাড়ছে অনেক বেশি। পরিকল্পনা কমিশনের আইএমইডি একটি অর্থবছরের বিভিন্ন প্রকল্প পর্যালোচনা করে দেখিয়েছে, প্রকল্প সমাপ্ত করার সময় বেশি লেগেছে ২৯ থেকে ২০০ শতাংশ। আর ব্যয় বেড়েছে ২৫ থেকে ২৫০ শতাংশ। পরের বছরগুলোর প্রকল্প পর্যালোচনা করলেও কম-বেশি একই ফল মিলবে বলে ধারণা করা হয়।

সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশীয় সূত্রে অর্থায়ন বাড়ছে। এটাকে অনেকেই ভালো লক্ষণ বলে মনে করেন। কিন্তু এর আরেকটি দিক রয়েছে। দেশীয় সূত্রে অর্থায়নের দায় তুলনামূলক বেশি। শুধু বিদেশি ঋণের তুলনায় বেশি পরিমাণে সুদ প্রদান নয়, এর আরেকটি সমস্যা হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্রে ঘাটতি। বিদেশি সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের তুলনায় দেশীয় অর্থের জন্য সুদ বাবদ ব্যয় বেশি পড়ে। পাশাপাশি আরও একটি বিষয় মনে রাখা চাই। আমাদের উন্নয়ন সহযোগীরা তাদের প্রদত্ত অর্থের ব্যয় সঠিক সময়ে সম্পন্ন হলো কিনা, কাজটি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সার্বক্ষণিক মনিটর করে থাকে। কিন্তু দেশীয় সূত্রে অর্থ গ্রহণ করা হলে এ বিষয়টি তেমনভাবে কার্যকর দেখা যায় না। সরকার চাইলেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিংবা বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এ অর্থের ব্যবহার যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা, সেটা নিয়ে কারও কাছে তারা জবাবদিহি করে না। আগামী অর্থবছরে পদ্মা সেতুসহ কয়েকটি বৃহৎ অঙ্কের অবকাঠামো প্রকল্প সরকার বাস্তবায়ন করতে চাইছে। এগুলোতে যেন অনিয়ম-দুর্নীতি না হয়, সেটা সরকারের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। আমাদের উন্নয়ন প্রকল্প

মূল্যায়নে বরাদ্দ করা অর্থের কতটা ব্যয় হয়েছে – সেটাই প্রধান মানদণ্ড হয়ে আছে। এখন সময় এসেছে এর গুণগত মান বিবেচনার। কাজটি সময়মতো হয়েছে এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি রয়েছে কিনা সেটা যেমন দেখতে হবে, তেমনি দেখতে হবে প্রকল্প থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলছে কিনা। ভারত, থাইল্যান্ডসহ কয়েকটি দেশ এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছে এবং তাদের অর্থনীতিতে তার সুফলও মিলতে শুরু করেছে।

বাজেটে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানে বেশ কিছু প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কর অবকাশের সময়সীমা বেড়েছে। ঢাকার বাইরে শিল্প স্থাপন করা হলে কর রেয়াত মিলবে। বিপুল সংখ্যক শিল্পের কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে। পুঁজিবাজারের জন্য রয়েছে রাজস্ব সুবিধা। ছোট-বড় সব ধরনের বিনিয়োগকারী এ পদক্ষেপকে সাধারণভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। এখন জরুরি হচ্ছে উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ বাড়াতে অন্যান্য পদক্ষেপের প্রতি মনোযোগ প্রদান। দেশে গ্যাস-বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুতের বড় প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের গতি যথেষ্ট শ্লথ। পোশাকশিল্প উদ্যোক্তারা বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছেন। এখন তাদের দিক থেকে করণীয় হচ্ছে ন্যূনতম মজুরি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন এবং কাজের পরিবেশ উন্নত করা। এর ফলে কর্মদক্ষতা বাড়বে এবং তাতে উদ্যোক্তারাও লাভবান হবেন। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এ শিল্প নিয়ে যে শঙ্কা, সেটা দূর হবে। সরকার পোশাকের বাইরে আরও কিছু রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য সুবিধা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে। এর ইতিবাচক প্রভাবও অর্থনীতিতে পড়বে বলে আশা করা যায়।

পরিশেষে বলব, অর্থমন্ত্রী তার আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যগুলো পর্যালোচনা করে দেখবেন এবং বাস্তবসম্মত পন্থা অনুসরণে মনোযোগী হবেন। এ লক্ষ্য অর্জনে যেসব আর্থিক, অবকাঠামোগত এবং অন্যান্য পদক্ষেপ জরুরি, সেগুলোও সবার মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা চাই।

সমকাল
৯ জুন ২০১৪

বিনিয়োগে আস্থার সংকট কাটাতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগবান্ধব বাজেট প্রণয়ন করতে হবে বলে মনে করেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, "আস্থার সংকট কাটাতে না পারলে বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব নয়। তাই বাজেটে এ জন্য উদ্যোগ থাকা জরুরি।" আসন্ন ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে এসব কথা বলেন ড. মোস্তাফিজুর রহমান।

তিনি বলেন, "কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট দ্রুত সমাধান করতে হবে। গত কয়েক বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষমতা বাড়লেও সে হারে প্রকৃত উৎপাদন বাড়েনি। এ ছাড়া কয়েক বছরে বিদ্যুতের চাহিদাও বেড়েছে। ফলে সংকট কাটছে না। সাময়িক সমস্যা সমাধানের জন্য রেন্টাল, কুইক রেন্টাল থেকে সরকার উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ কিনছে। এসব বিদুৎকেন্দ্রের মেয়াদ ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অথচ এখন স্থির খরচ না থাকায় কম মূল্যে বিদ্যুৎ কেনাই ছিল যৌক্তিক। সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ কেনার ব্যাপারে সরকারের নজর দেওয়া প্রয়োজন। আর টেকসই উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়া দরকার। এ বিষয়ে বাজেটেও সুর্নিদিষ্ট নির্দেশনা থাকা উচিত।"

এই অর্থনীতিবিদ মনে করেন, রপ্তানি আয় বাড়াতে রপ্তানির বাজার বহুমুখীকরণের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। সম্ভাবনাময় দেশে বাণিজ্যিক উইং খুলে বাজার শক্তিশালী করতে হবে। রাজস্ব আয়-ব্যয় কাঠামো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "২০০৯-১০ অর্থবছরের

পর এ বছরই প্রথম জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়েছে। এগারো হাজার ৯০০ কোটি টাকা কমিয়েও রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ব্যয় মেটাতে সরকারকে ঋণ করতে হচ্ছে। এদিকে ঘাটতির পরিমাণ জিডিপির তুলনায় কম হলেও ঘাটতি অর্থায়ন নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে। কারণ ঘাটতির প্রায় ৯১ ভাগই অর্থায়ন করা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ খাত থেকে ঋণ করে। ফলে সুদ বাবদ ব্যয় বাড়ছে। উন্নয়ন-বহির্ভূত ব্যয় হিসেবে সুদ একটি বড় খাত হিসেবে পরিণত হচ্ছে। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিদেশি অর্থায়নে উন্নয়ন ব্যয় বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে।"

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, "বর্তমানে তুলনামূলকভাবে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেশি। উৎপাদক ও কৃষক পর্যায়ে পণ্যের দাম কম হলেও ভোক্তা পর্যায়ে দাম বেশি। উৎপাদক ও ভোক্তা পর্যায়ের পার্থক্য যাচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে। বিপণন ও বাজার ব্যবহার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে হলে এখানে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো আছে সেগুলোকে সনাক্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে। আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে।" তিনি বলেন, "বাজেট ঘাটতির অর্থায়নে বৈদেশিক সাহায্যভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে ও পাইপলাইনে থাকা বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করতে হবে।"

বাংলাদেশ প্রতিদিন
৩ জুন ২০১৪

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে কিছু পদক্ষেপ পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

কালের কণ্ঠ: আপনার দৃষ্টিতে আগামী (২০১৪-১৫) অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট কেমন হয়েছে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত প্রস্তাবিত বাজেটে অনেক ক্ষেত্রে চলতি অর্থবছরের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। একই সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা না করেই অনেক উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এড়িয়ে গেছেন বর্তমান অর্থনীতির গতিধারা ও অর্থনীতি-বহির্ভূত বিষয়গুলো; যেমন রাজনীতি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। প্রস্তাবিত বাজেটের আকার প্রয়োজন ছাড়া বড় করেছেন; প্রবৃদ্ধি, রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা, বিনিয়োগ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, ঋণ, ঘাটতিসহ আরও বিভিন্ন বিষয়ে যে হিসাব তিনি করেছেন, তা অর্জন করা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তাই এসব বিষয় পুনর্বিবেচনা করে বাজেট চূড়ান্ত করা উচিত। এতে অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় থাকবে। অর্থবছরের শেষ সময়ে হিসাব মেলাতে কাটছাঁটের প্রয়োজন হবে না।

কালের কণ্ঠ: বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বাজেট। বড় অঙ্কের ঘাটতি অর্থনীতির ওপর কেমন প্রভাব ফেলবে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: দুই লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেটে সাতষট্টি হাজার ৫৫২ কোটি টাকা ঘাটতি। আমাদের মতো দেশের বাজেটে এত বড় ঘাটতি অর্থনীতির সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি। আবার বিদেশি ঋণ, সাহায্য বা অনুদানের

নিশ্চয়তাও নেই। অনেক ঋণ, সাহায্য ও অনুদান পাইপলাইনে থাকলেও তা কবে নাগাদ পাওয়া যাবে, তারও সুনির্দিষ্ট তারিখ নেই। অন্যদিকে আগামী অর্থবছরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পে স্কেল বাড়ানোর বিষয়টি রয়েছে। বাড়তি অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। এমন পরিস্থিতিতে এত বড় অঙ্কের ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ খাত থেকে ঋণ নিতে হবে। চলতি অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে ঋণের চাহিদা না থাকায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। আগামী অর্থবছরেও এ ধারা চলমান থাকলে সুদ-ব্যয় বাড়বে। সার্বিক ব্যয়-কাঠামোতে চাপ পড়বে। তাই অর্থায়নের নিশ্চয়তা না নিয়েই বড় অঙ্কের ঘাটতি নির্ধারণ করায় অর্থনীতি ঝুঁকিতে পড়বে।

কালের কণ্ঠ: প্রস্তাবিত বাজেটের ৬২ শতাংশ আয়ই ধরা হয়েছে রাজস্ব খাত থেকে। চলতি অর্থবছরে রেকর্ড রাজস্ব ঘাটতি সত্ত্বেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) জন্য উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এনবিআর-বহির্ভূত খাত থেকেও আগামী অর্থবছরে রাজস্ব আদায় কম হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আগামী অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ে উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও এর ওপর এত নির্ভরশীলতা কতটা বাস্তবসম্মত?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি বেসরকারি খাত। সরকারের প্রতি আস্থা না থাকায় তারা বিনিয়োগে এগিয়ে আসছে না। আবাসন খাতের চলমান মন্দা অতি দ্রুত কেটে যাবে বলে মনে হচ্ছে না। থ্রিজি লাইসেন্স ও মোবাইল ফোন নবায়ন খাতেও চলতি বছরের ধারাবাহিকতা আগামী অর্থবছরে থাকবে না। এমন প্রেক্ষাপটে রাজস্ব আদায়ে উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ যুক্তিসঙ্গত নয়। বিশেষভাবে চলতি বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে এক লাখ ৪৯ হাজার ৭২০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় এনবিআর-এর পক্ষে সম্ভব হবে না বলেই আশঙ্কা রয়েছে। এতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন নিয়েও সংশয় থাকছে। সরকারের আয় না থাকলে ব্যয় মেটাতে হিমশিম খেতে হবে। পর্যাপ্ত অর্থায়ন না থাকলে যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হবে, তা অসমাপ্ত থাকবে। কোনো কোনোটি শুরুই করতে পারবে না।

কালের কণ্ঠ: আগামী অর্থবছরে এনবিআর-এর অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের কৌশলেও আনা হয়েছে নতুন ধারা। আয়কর আদায়ে জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমান ভ্যাট (ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স) আইন ও কাস্টমস অ্যাক্ট বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন কৌশল বাস্তবায়নে এনবিআর-এর রাজস্ব আদায়ে কতটা গতিশীলতা আসবে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: প্রথমেই মনে রাখতে হবে, এনবিআর এখনো সম্পূর্ণ অটোমেশনে যেতে পারেনি। আগামী অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের আওতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে দপ্তর স্থাপন ও ভ্যাটের পরিধি বাড়ানোর প্রস্তাব করা

হয়েছে। এ দেশের আমলাতান্ত্রিক জটিলতাপূর্ণ ধীরগতির প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দেশব্যাপী রাজস্ব দপ্তর সম্প্রসারণে ছয় মাস বা তারও বেশি সময় লাগতে পারে। অর্থ বরাদ্দ, নতুন জনবল নিয়োগ থেকে শুরু করে অনেক বিষয়ে আলোচনা হবে। এ ছাড়া রাজস্ব দপ্তর স্থাপনসহ অন্যান্য প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াতেই অর্থবছর পার হবে। আবার ভ্যাটের আওতা বাড়ালেও তা আদায় করবে কে? এনবিআর-এর বর্তমান লোকবল প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেকও নেই। শহরকেন্দ্রিক ভ্যাট আদায়েই এখনো সক্ষম নয় এনবিআর। সেখানে উপজেলা পর্যায়ের দোকান থেকে এনবিআর কর্মকর্তারা হিসাব যাচাই-বাছাই করবেন, এটা বর্তমান বাস্তবতায় অসম্ভব। অন্যদিকে প্রস্তাবিত বাজেটে কাস্টমস অ্যাক্ট অনুসরণে শুল্ক-সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নে চলতি বছরে যেসব খাত থেকে শুল্ক আদায় হতো, তা থেকে আগামীতে আদায় কমবে। তাই সার্বিক বিচারে এনবিআর-এর সক্ষমতা বাড়াতেই আগামী অর্থবছর কেটে যাবে। আগামী অর্থবছরে নেওয়া কৌশলগুলো ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সফলভাবে বাস্তবায়নের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কোনোভাবেই এত বড় অঙ্কের প্রস্তাবিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা এনবিআর অর্জন করতে পারবে না। চূড়ান্ত বাজেটে এনবিআর-এর জন্য রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা কমানো না হলে এ বছরের মতো আগামী অর্থবছরেও আবার লক্ষ্যমাত্রা সংশোধনের প্রয়োজন হবে।

কালের কণ্ঠ: চলতি অর্থবছরের তুলনায় আগামী অর্থবছরে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত ভ্যাট আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ভ্যাটের আওতা বাড়ানো হয়েছে। নতুন অনেক পণ্যে ধার্য হয়েছে নতুন ভ্যাট। সাধারণ মানুষের ওপর নতুন এ উদ্যোগের কী প্রভাব পড়বে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: পরোক্ষ কর রাজস্ব আদায়ের নিরাপদ হাতিয়ার। তাই আগামী অর্থবছরে এত বড় অঙ্কের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরোক্ষ কর হিসেবে ভ্যাটের আওতা বাড়িয়ে নতুনভাবে ভ্যাট আরোপের চেষ্টা করা হয়েছে। এর বিকল্প কিছু এনবিআর-এর সামনে নেই। এ সবই নতুন ভ্যাট আইন অনুসারে গ্রহণ করা হচ্ছে। এসব উদ্যোগের প্রভাবে স্বল্প আয়ের মানুষের ওপর আবারও ভ্যাটের আঘাত পড়ল। বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়বে। প্রত্যন্ত এলাকার যেসব দোকানদারের আয় কম, তারাও পর্যায়ক্রমে ভ্যাটের আওতায় আসবে।

কালের কণ্ঠ: অতীতে পরোক্ষ কর আদায়ে গুরুত্ব দেওয়া হলেও আগামী অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর সুফল কতখানি পাওয়া যাবে রাজস্ব আদায়ে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: জনসংখ্যাবহুল এ দেশে আরও আগেই প্রত্যক্ষ কর আদায়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। মূলত ধনীরা থাকে আয়করের আওতায়। অন্যদিকে পরোক্ষ

কর যত বাড়ানো হবে, ততই সাধারণ জনগণের ওপর এর ভার পড়বে। অতিদরিদ্র মানুষ থেকে দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিকে একই হারে পরোক্ষ কর পরিশোধ করতে হবে। পরোক্ষ কর ছেড়ে প্রত্যক্ষ করে গুরুত্ব দেওয়া হলে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমবে। প্রত্যক্ষ কর আদায়ে যেসব কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, তা আগামী অর্থবছরে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। তবে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এসব কৌশলের সুফল পাওয়া যাবে। তাই দেরিতে হলেও প্রত্যক্ষ করকে রাজস্ব আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করায় সুফল পড়বে রাজস্ব আদায়ে।

কালের কণ্ঠ: করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধি, করপোরেট কর কমানোর দাবি ছিল ব্যবসায়ীদের। প্রস্তাবিত বাজেটে এসব বিষয়ে নেওয়া পদক্ষেপ যৌক্তিক মনে করেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। স্বল্প আয়ের মানুষদের করের আওতার বাইরে রাখা উচিত। ধনীদের কাছ থেকে আদায় বাড়াতে আরও জোর দেওয়া উচিত। সার্বিক বিবেচনায় করমুক্ত আয়সীমা তিন লাখ টাকা নির্ধারণ হওয়া উচিত। করপোরেট কর কমানোর প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। অনেক দেশের তুলনায় এ হার বাংলাদেশে কম।

কালের কণ্ঠ: অপ্রদর্শিত অর্থ সাদা করা ও আবাসন খাতে ফ্ল্যাট ও প্লট কিনতে সুযোগ রাখা হয়েছে। অথচ অর্থমন্ত্রী বাজেট-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, এসব সুযোগ চূড়ান্ত বাজেটে থাকবে না। সম্প্রতি অর্থপাচার বেড়েছে। অনেকে বলছেন, দেশে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের সহজ সুযোগ দেওয়া হলে অর্থপাচার কমবে। আপনার মত কী?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: সৎ ব্যক্তিকে কর দিতে উৎসাহিত করতেই অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগ ও সাদা করার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। এ বিষয়ে বাজেটে সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা উচিত। কালো টাকার মালিককে কিছু জরিমানা দিয়ে অর্থ সাদা করার সুযোগ দেওয়া মানেই হলো অনৈতিক কার্যক্রমকে প্রশ্রয় দেওয়া। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কঠোর প্রয়োগে অর্থপাচার বন্ধ করতে হবে।

কালের কণ্ঠ: ব্যাংকের মাধ্যমে বাড়িওয়ালাদের ভাড়া আদায়, গ্রিন ট্যাক্স, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সারচার্জ, শ্রমিক উন্নয়ন সারচার্জসহ নতুন অনেক ধারণা আনা হয়েছে আগামী বাজেটে। এসব বিষয়ে আপনার মত কী?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: পঁচিশ হাজার টাকার বেশি বাড়ি ভাড়া ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রহণের আইনটি অবশ্যই থাকা উচিত। এতে রাজস্ব আদায়ের একটি বড়

খাত নজরদারিতে আসবে। গণমাধ্যমের সাহায্যে এ বিষয়ে জনসমর্থন তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এ আইনটি বাতিলে সমাজের অনেক অসাধু ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আগ্রহী হবে। তবে এ আইনটি বাস্তবায়নে এনবিআর-কে আরও সক্ষম হতে হবে। পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপন ছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসা করা যাবে না। তাই গ্রিন ট্যাক্স ধারণা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরোপ করা সারচার্জ কতটা আদায় হবে, তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। কারণ দেশে দুই কোটি টাকার উপরে ধনী ব্যক্তিদের যে সংখ্যা এনবিআর ঘোষণা করে, তার সঙ্গে অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করেন। মোটা দাগে এ হিসাব সঠিক বলে মনে হয় না।

কালের কণ্ঠ: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের ভর্তুকি কমানোর সুপারিশ ছিল বিভিন্ন দাতা সংস্থার। এ সুপারিশ মানতেই প্রস্তাবিত বাজেটে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এতে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকছে। সাধারণ মানুষের ওপর আবারও মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব পড়বে। এ বিষয়ে আপনার মত কী?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: প্রস্তাবিত বাজেটে জ্বালানি খাতে ভর্তুকি চলতি বছরে অর্ধেকের বেশি কমানো হয়েছে। তেলের দাম বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের ওপর আরও বেশি পড়বে মূল্যস্ফীতির প্রভাব। যাতায়াত খরচ বেড়ে যাবে। ভোক্তা পর্যায়ের চাহিদায় যে টানাপোড়েন রয়েছে, তা আরও বাড়বে।

কালের কণ্ঠ: অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রস্তাবকালে বলেন, বিনিয়োগে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ ফিরিয়ে আনাই আগামী অর্থবছরে মূল লক্ষ্য। প্রস্তাবিত বাজেটে বেসরকারি খাতের জন্য বেশ কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এসব পদক্ষেপের ফলে শিল্প বিনিয়োগে কতটা আগ্রহী হবে উদ্যোক্তারা?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: কর অবকাশ সুবিধা বাড়ানো, কিছু কাঁচামালের আমদানি শুল্ক কমানোসহ বেশ কিছু প্রস্তাব রয়েছে, যা গ্রহণে উদ্যোক্তারা সুফল পাবেন। বাজেটে উদ্যোক্তাদের যেসব সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো নয়। ব্যবসায়ীরা নিরাপত্তহীনতায় ভুগছেন। অর্থ বিনিয়োগ নিরাপদ মনে করছেন না। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যেও সমঝোতা নেই। তাই বিরাজমান সমস্যাগুলো দূর না হলে আগামী এক সপ্তাহ বা এক বছরেও যত সুবিধাই দেওয়া হোক, কেবল তার জন্য বেসরকারি খাত শিল্প বিনিয়োগে আগ্রহী হবে না। আবার অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি সংকট দূর

করতে প্রস্তাবিত বাজেটে চলতি বছরের ধারাবাহিকতায় কাগজ-কলমের বাইরে আসতে পারেনি সরকার।

কালের কণ্ঠ: আগামী অর্থবছরে ৭৭০টি পণ্যে সম্পূরক শুল্ক কমানো হয়েছে। এর কী প্রভাব পড়বে শিল্প খাতে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: যেসব পণ্যের সম্পূরক শুল্ক কমানো হয়েছে, তা কম দামে আমদানি করা যাবে। অথচ এসব পণ্যের অধিকাংশই দেশীয় শিল্প কারখানায় যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে কোনো কোনোটি। তাই প্রস্তাবিত বাজেটের এ পদক্ষেপ দেশীয় শিল্পকে কঠিন প্রতিযোগিতায় ফেলে দেবে। চূড়ান্ত বাজেটে এ প্রস্তাব পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

কালের কণ্ঠ: অর্থনীতি-বহির্ভূত বিষয় অর্থনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে অর্থনীতিতে। এ বিষয়ে প্রস্তাবিত বাজেটে কোনো দিকনির্দেশনা আছে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: এত বড় বাজার পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। সুন্দর ও স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করলেই আহ্বান জানানোর প্রয়োজন হবে না, এমনিতেই শুধু দেশি নয়, বিদেশি উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে। তাই সরকারের সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া উচিত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ দিলেই হবে না, প্রকৃত সদিচ্ছা থাকতে হবে। প্রশাসনিক কাঠামোকেও সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। চূড়ান্ত বাজেটে এ বিষয়গুলোতে আরও স্বচ্ছতা আনার প্রয়োজন রয়েছে।

কালের কণ্ঠ: প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ পর্যাপ্ত মনে হয়? এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: চলতি বছরের তুলনায় প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের হার কম। প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি ও শিক্ষায় যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তা না বাড়ালেও স্বাস্থ্য খাতে চূড়ান্ত বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো উচিত। তবে কৃষি খাতে কিছু উদ্যোগ ভালো হয়েছে। বিশেষভাবে কৃষি থেকে করমুক্ত আয়সীমা দুই লাখ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া চলতি বছরের ভালো কাজগুলো গতিশীল রাখা হয়েছে। তবে কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেই প্রস্তাবিত

বাজেটে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত বাজেটে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে তৃণমূল পর্যায়ে চিকিৎসাসুবিধা পৌঁছানোর মতো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এ বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। শুধু প্রতিষ্ঠান আর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ালেই হবে না, শিক্ষা খাতের মান বৃদ্ধিতে কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়েও প্রস্তাবিত বাজেটে সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই।

কালের কণ্ঠ
২২ জুন ২০১৪

সাক্ষাৎকারঃ ফারজানা লাবনী

বাজেটের গুণগত উৎকর্ষের দিক মাথায় রাখতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

কালের কণ্ঠ: প্রায় ২৫০ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষিত হচ্ছে। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য রেখে এ বাজেট প্রণীত হচ্ছে বলে কি মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: বাংলাদেশে রাজস্ব ব্যয় ও বিভিন্ন উন্নয়ন ব্যয়ের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে – এটাই স্বাভাবিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত সরকারি সেবার চাহিদা বাড়বে, সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন ও তার মাধ্যমে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ আকর্ষণের প্রয়োজনীয়তাও আগামীতে বৃদ্ধি পাবে। আমাদের স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে আগামীতে ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই বাজেটের পরিমাণগত দিকের চেয়ে, আমার মনে হয়, গুণগত উৎকর্ষের দিকটিতে আমাদের বেশি মনোযোগী হতে হবে। এ বাজেটে আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের কোনো অসামঞ্জস্য আমি দেখি না। বাংলাদেশের জন্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের সুযোগ বাড়বে, একই সাথে উন্নয়নের জন্য অর্থের চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এ বর্ধিত আয় কোন সূত্র থেকে আনা শ্রেয় হবে, এ বর্ধিত ব্যয়ের বণ্টন কীভাবে হবে – এদিকটাই হতে হবে বেশিভাবে বিবেচ্য। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ বাজেটের গুণগত-পরিমাণগত বাস্তবায়ন যাতে ভালোভাবে করা যায়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন যথাযথ সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ ও প্রণোদনা কাঠামোর বিন্যাস, বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুশাসন।

কালের কণ্ঠ: এবারের বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখা হচ্ছে না। এতে আশঙ্কা করা হচ্ছে অর্থপাচার প্রবণতা বেড়ে যাবে। কালো টাকা সাদা না করার সরকারি এ সিদ্ধান্তকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: এ বাজেটে কালো টাকা সাদা করার বিধান যদি রাখা না হয়, তবে তা হবে আমার মতে একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। সিপিডি থেকে আমরা সবসময়ই বলে আসছি, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখা নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক – কোনো প্রাসঙ্গিকতায়ই কাম্য নয়। এটা রাজস্ব শৃঙ্খলা, সর্বোপরি অর্থনৈতিক শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। যারা সৎভাবে কর দেন, কালো টাকা সাদা করার সুবিধা তাদেরকে কর প্রদানের নিরুৎসাহিত করে। বিগত দিনে দেখা গেছে কালো টাকা সাদা করার মাধ্যমে সরকার যে রাজস্ব পেয়েছে, তার পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। কালো টাকা সাদা করার সুযোগ থাকায় অনেকেই মনে করেন, এখন রাজস্ব না দিয়ে পরে দিলেও চলবে, এবং কম হারেই তখন দেবার সুযোগ পাওয়া যাবে – তাহলে এখন কেন দেব। ফলে অর্থনীতিতে রাজস্ব আহরণের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় একটা নেতিবাচক অবস্থানের তৈরি হয়। সুতরাং কালো টাকাকে আইনি প্রক্রিয়ায় মোকাবেলা করতে হবে। আইন শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে, দণ্ড ও মাশুল যৌক্তিক করতে হবে, আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। আর অর্থপাচারের বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য। কালো টাকাই বেশি বাইরে যাবার প্রবণতা থাকে, কিন্তু কালো টাকা সাদা করে তা মোকবেলা করা যে যায় না বাংলাদেশ থেকে পুঁজি পাচারের উপাত্ত দেখলেই তা বোঝা যায়। কালো টাকা দেশে ও অর্থনীতিতে সুশাসনের অভাবকে একদিকে প্রতিফলিত করে; অন্যদিকে তা সুশাসনের বিপরীতে কাজ করে।

কালের কণ্ঠ: স্থায়ী অবকাঠামোগত উন্নয়নের স্বার্থে কৃষি-শিল্পসহ এবারের বাজেটে কোন কোন ক্ষেত্রকে আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: বাজেট পেশ করা হলে বোঝা যাবে নীতি-নির্ধারকরা কোন কোন খাতকে বণ্টনের দৃষ্টি থেকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্বালানি-বিদ্যুৎ, অবকাঠামো, সড়ক যোগাযোগ – এসব খাত গতানুগতিকভাবে এবং যৌক্তিকভাবে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এ বাজেটে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি এবং শিল্প খাত – দুটিই বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, আর এক্ষেত্রে অবকাঠামোতে বিনিয়োগ একটা বড় ভূমিকা রাখে। বর্তমান সরকার এক্ষেত্রে বেশ কিছু সফলতা অর্জন করেছেন। কিন্তু সাশ্রয়ীভাবে ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়টি এখন ক্রমান্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ

হয়ে উঠবে। এবার ভর্তুকি কিছুটা কম প্রয়োজন হবে বলে মনে হয়। কারণ বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম বর্তমানে নিম্নমুখী, খাদ্যশস্যের দামও স্থিতিশীল। তাই ভর্তুকি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকার সুবিধাজনক একটা অবস্থানে থাকবে। কৃষি খাতে উৎপাদিত পণ্যের বিপণনে ও বাজারজাতকরণে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বাজেটে, যেমনটি প্রয়োজন কৃষির সাথে শিল্পে অগ্র ও পশ্চাৎ সংযোগ শক্তিশালী করা।

যেসব স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প আছে, সেগুলোর উন্নয়নের জন্য যথাযথ শিল্প-উন্নয়ন কৌশল প্রয়োজন। বাজেটে বরাদ্দ ও কর-কাঠামো হতে হবে সে কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সে কৌশল বাস্তবায়নের জন্য উপযোগী। প্রণোদনা কাঠামো ও প্রকৃত সংরক্ষণের হার সে আঙ্গিকে বাজেটে প্রতিফলিত হতে হবে। সম্পূরক শিল্পে করহার হ্রাস করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। সেটাও গৃহীত কৌশলের সাথে সংশ্লেষ করে নিতে হবে। বাজেট উপস্থাপনের পরেই কেবল আমরা এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাব। আমরা আশা করব, কৃষি খাতে, বিশেষত বৃহত্তর কৃষি খাতে, যেমন শস্য খাত, লাইভস্টক, পোল্ট্রি খাত, ফিশারিজ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে যুক্ত যেসব খাত – সেসব খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকবে। গ্রাম থেকে অনেকে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে শিল্প খাতের সাথে যুক্ত হতে আগ্রহী। কারিগরি শিক্ষা তাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির ব্যবহারে ও কর্মোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সাশ্রয়ীভাবে বাজেটের বাস্তবায়ন এদিকগুলোতে বেশি মনোযোগ দিতে হবে।

কালের কণ্ঠ: বিরাট পরিসরের এ বাজেট কেবল ঘোষণা নয়, বাস্তবায়ন করাও হবে সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ। বাজেটের সুষম বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকার তার বাজেট বাস্তবায়নের এ চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবিলা করবে বলে মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: বাজেটের আকার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে – রাজস্ব বাজেটের আকার বাড়ছে, উন্নয়ন বাজেটের আকার বাড়ছে; অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছে সমান্তরালভাবে। উন্নয়ন প্রশাসনকে সাজানোর জন্য সরকার নতুন সিভিল সার্ভেন্টস অ্যাক্ট করার কথা বলেছিল। এখন আর তা শোনা যাচ্ছে না। সেবা প্রদানের সক্ষমতা, দক্ষতা বৃদ্ধির চাহিদা ও প্রণোদনা কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের কথা বিবেচনায় নিলে এ ধরনের সংস্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকার আশা করি এ বিষয়ে উদ্যোগ নেবে। সংস্কার কর্মসূচির আওতায় কোন কোন খাতগুলোর সংস্কার ইতিমধ্যে করা হয়েছে, অসম্পূর্ণতার জায়গাগুলো কী কী, কোনগুলোর কার্যক্রম চলমান আছে, ভবিষ্যতের

পরিকল্পনা কী – এসব বিষয়ে অর্থমন্ত্রী গত বাজেটে একটা ধারণা দিয়েছিলেন। আশা করি, এবারের বাজেটেও এ ব্যাপারে একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকবে। বাজেটের বাস্তবায়ন সম্ভাবনা ও গুণগত মানের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ও খাতভিত্তিক সংস্কার কর্মকাণ্ডের একটা সরাসরি সংযোগ আছে।

কালের কণ্ঠ
২৭ মে ২০১৪

সাক্ষাৎকারঃ আলমগীর কবীর

অধ্যায় ৩

মানবসম্পদ ও নাগরিক অধিকার

সম্ভাবনার প্রজন্ম: মানবসম্পদ

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

জাতিসংঘ জনসংখ্যা প্রতিবেদন, ২০১৪ প্রকাশের পর গণমাধ্যমে তরুণদের সম্ভাবনার দিকটি বিশেষভাবে সামনে এসেছে। বিশ্বব্যাপীই এখন ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশন চলছে। এর একটি কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি। শিক্ষার বিস্তারও বিবেচনায় রাখতে হবে। উন্নত ও অনুন্নত সব ধরনের দেশেই গড় আয়ু বাড়ছে, জন্মহার নিয়ন্ত্রণে এসেছে। শিশুমৃত্যু রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। পরিবারে সন্তানসংখ্যা কম থাকছে। এর ফলে জনসংখ্যার কাঠামোগত একটি পরিবর্তন ঘটছে। জাতিসংঘ প্রতিবেদনে এর যে চিত্র রয়েছে তাতে দেখা যায়, বাংলাদেশ এখন এ ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। আমাদের ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণের সংখ্যা চার কোটি ৭৬ লাখ। যা মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ। এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে কীভাবে আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবচেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারি, সেটাই বর্তমানের চ্যালেঞ্জ।

আমরা এ সুযোগটিকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডে পরিণত করতে পারব কিনা, সেটাই প্রশ্ন। এটা আপনাআপনি ঘটবে না, বরং এজন্য চাই পরিকল্পিত প্রয়াস। আরও মনে রাখতে হবে, আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। সাধারণভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে এর ব্যাপ্তিকাল ৫০ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে এটা ৩০-৩৫ বছর হবে বলে কেউ কেউ অভিমত দিচ্ছেন। এমনকি এটা ২৫ বছরও স্থায়ী হতে পারে। এখন কীভাবে এ সময়ের মধ্যেই আমরা তরুণ প্রজন্মকে ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তুলতে পারব? অনেকে বলেন, তরুণরাই দেশের ভবিষ্যৎ। কিন্তু তারা তো বর্তমান এবং তাদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে আমাদের জন্য সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারে। এক অর্থে তারা নিজেদের জন্যই সুন্দর আগামীর ভিত রচনা করবে।

আমাদের দেশের নারী সমাজ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের যুক্ত করছে। এর পরিবেশও নানাভাবে সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ যাতে কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয়, সেটা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। নারীরা যত বেশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবে, তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে নানা ক্ষেত্রে। তাদের দেরিতে বিয়ে হবে, পরিবারে সন্তানসংখ্যা কমবে। তৈরি পোশাকশিল্পের নারীদের জীবনযাত্রা থেকেও এটা নিশ্চিত হওয়া যায়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার সন্তান ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ স্থানান্তর করতে পারে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবি রাখে। আমরা দেখি, বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বেশি সুবিধা ভোগ করে। একজন ছেলের তুলনায় মেয়েদের জন্য অনেক বেশি বিধি-নিষেধ। রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে এ ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা। শ্রমবাজারেও নারী নানা ধরনের সমস্যায় পড়ে। বলা হয়, এটা মেয়েরা পারবে এবং এটা পারবে না। এ কারণে তাদের আইনগত সমস্যাও সৃষ্টি হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেবল শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানো নয়, কীভাবে তরুণ-তরুণীরা নিজেদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য গড়ে তুলছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশ কিছু ভালো পদক্ষেপ নিতে পেরেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা সমান হয়েছে। স্কুলে বিনামূল্যে বই দেওয়া হচ্ছে এবং চার কোটির মতো ছাত্র-ছাত্রী তার সুফল ভোগ করছে। লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে বৃত্তি সুবিধা পাচ্ছে। তবে এখন সময় এসেছে কেবল সাধারণ শিক্ষা নয়, বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রতি মনোযোগ বাড়ানোর। নন-আইটি থেকে আইটির দিকে আমাদের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তরুণ প্রজন্মও এটা চাইছে।

স্বাস্থ্যসেবাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেদনে বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের জন্য সুবিধা বাড়ানোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। বাল্যবিয়ে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের নীতি গ্রহণ করতে হবে। অন্য কথায়, কেবল খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ নয়, নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার জন্য মনোযোগের আরও অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এসব খাতে বিনিয়োগের প্রচুর সুফল পাওয়া যায়। তারা দক্ষ ও যোগ্য হয়ে উঠলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তার বিপুল প্রভাব পড়ে।

অন্যদিকে, তাদের শ্রম ও মেধা কাজে লাগাতে না পারলে প্রবৃদ্ধির হার কমে যায়, দারিদ্র্য কমার হার শ্লথ হয়। জীবনে চলার পথে ছন্দপতন হলে অনেকের মধ্যে নেমে আসে হতাশা। পরিণতিতে সন্ত্রাস বাড়ে, সন্ত্রাসবাদের হুমকি সৃষ্টি হয়। অনেকে জড়িয়ে পড়ে

নানা ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে। এর প্রভাব রাজনৈতিক অঙ্গনেও পড়তে পারে। এটা কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

কেউ কেউ ভাবতে পারেন, জনসংখ্যা বিন্যাসের কারণে যে সুবিধা সেটা কাজে লাগানো বা না লাগানো ঐচ্ছিক বিষয়। এ সুযোগ হাতছাড়া হলে কী ধরনের মন্দ পরিণতি হতে পারে সে বিষয়েও সচেতনতার অভাব রয়েছে। আমরা যদি ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণদের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী না হই, তাহলে তাদের সম্ভাবনাই কেবল ধ্বংস করা হবে না, তারা বিপদেরও কারণ হয়ে উঠতে পারে। 'আমরা বিনিয়োগ করতে পারলাম না, তাই কী আর করা'– এমন মনোভোব কোনোভাবেই গ্রহণীয় হবে না।

তরুণদের বিষয়ে বাংলাদেশের রয়েছে জাতীয় যুবনীতি। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যুগের চাহিদার সঙ্গে কমবেশি সঙ্গতিপূর্ণ। তাদের অধিকার, সমস্যা প্রভৃতি বিষয় এতে উল্লেখ রয়েছে। তাদের বিকাশের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবায়ন কৌশল সংক্রান্ত দিকগুলো দেখতে গিয়ে আমরা ততটা আশাবাদী হতে পারি না। যুব উন্নয়নের বিষয়গুলো বাস্তবায়নে অন্য আরও কয়েকটি মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এর একটি হচ্ছে তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। কৃষি বিষয় দেখাশোনা করে কৃষি মন্ত্রণালয়। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প রয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের হাতে। নারীদের কিছু বিষয় বাস্তবায়ন করে আরেকটি মন্ত্রণালয়। এসব মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে সমন্বয় এখন জরুরি হয়ে পড়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জেন্ডার বাজেট গুরুত্ব পাচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষ সমতা কতটা রক্ষা করা হচ্ছে সেটা জানতে চায়। এর প্রভাব বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে পড়ছে। একইভাবে ইয়ুথ বাজেটিংও আলোচনায় আসা উচিত বলে আমি মনে করি। কোন মন্ত্রণালয় কী ধরনের কর্মসূচি প্রণয়ন করছে এবং কীভাবে তার বাস্তবায়ন হচ্ছে সে তথ্য হালনাগাদ করা চাই।

সত্তরের দশকের শুরুতে আমাদের তরুণ প্রজন্ম দেশকে স্বাধীনতা উপহার দিয়েছে। লাখ লাখ তরুণ মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। স্বাধীনতার চার দশক পর এমন এক প্রজন্ম আমাদের সামনে যারা মোট জনসংখ্যায় উল্লেখযোগ্য অবস্থানে রয়েছে। তাদের মেধা ও সৃজনশীলতা রয়েছে এবং তা কাজে লাগাতেই হবে। এজন্য যথাযথ পরিকল্পনা দরকার এবং তার বাস্তবায়নে আর্থিক ও অন্যান্য বিনিয়োগ দরকার। এ থেকে দূরে থাকার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। যুগের দাবি আমাদের পূরণ করতেই হবে।

সমকাল

২০ নভেম্বর ২০১৪

২০২১ সালে ৫০ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি: সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল ঠিক করতে হবে

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

তৈরি পোশাক খাত থেকে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল ঠিক করা দরকার বলে মনে করেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। সকালের খবরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, কর্মকৌশল ঠিক করে তা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোক্তা এবং সরকার উভয়কেই কাজ করতে হবে। বড় যে লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে তার জন্য সরকারের তরফ থেকে এ খাতকে সার্বিক শিল্পায়নের অংশ হিসেবে নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে দেখা ঠিক হবে না। যাতে অন্য শিল্প খাতের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত না হয়। সরকারকে সবার আগে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর, ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ের উন্নয়ন, উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ জমির ব্যবস্থা করা। এছাড়া গ্যাস ও বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

আর উদ্যোক্তাদের জন্য বলতে হয়, লক্ষ্য যখন ঠিক হয়ে গেছে, এখন দরকার কেবল কৌশল ঠিক করে এগিয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে বিজিএমইএ, বিকেএমইএসহ সংশ্লিষ্ট সব বাণিজ্য সংগঠনকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

অ্যাপারেল সামিট সম্পর্কে খন্দকার মোয়াজ্জেম বলেন, অ্যাপারেল সামিট বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। রানা প্লাজা ও তাজরীন দুর্ঘটনার পর এ খাতের কর্মপরিবেশ নিরাপত্তা নিয়ে কী ধরনের সংস্কারমূলক কাজ করা

হয়েছে তা বিদেশি ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরা গেছে। এছাড়া রপ্তানির যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা পূরণের জন্য যেসব বাধা – বিশেষ করে অর্থায়ন, অবকাঠামোর উন্নয়ন, পণ্য উৎপাদনের চেইন অব কমান্ড এবং বিশ্ববাজারে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, যেহেতু সামিটে ইউরোপ-আমেরিকাসহ প্রায় ১০টি প্রধান ক্রেতা দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন সেহেতু বহির্বিশ্বে একটি ভালো মেসেজ গেছে।

লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সন্তুষ্ট করাও প্রয়োজন। কারণ শ্রমিক অসন্তোষ এই শিল্পে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে। সরকার দলীয় বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের টাকা দিয়ে কিংবা তাদের ছত্রছায়ায় গঠিত সংগঠন দিয়ে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করার বর্তমান পদ্ধতি বিপদ বয়ে আনবে। মালিকরা এখন যেভাবে ট্রেড ইউনিয়নকে এড়িয়ে যান সেটি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং এটিকে পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রাখতে পারলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। এছাড়া আইন অনুযায়ী মুনাফার একটি অংশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে দিতে হবে মালিকদের, যাতে আপৎকালীন সময়ে ইতিবাচকভাবে শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান করা যায়।

শ্রমিক ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে বিজিএমইএ-র উচিত একটি প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা। এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পণ্য কাঠামোর পরিবর্তন, মজুরি বৃদ্ধি, বিনিয়োগ, বিশ্ববাজার পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করে সেই তথ্য-উপাত্ত বিবেচনায় নিতে হবে। তারপর পরিকল্পনাটি নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বা দরকষাকষিতে যাওয়া উচিত। পরিকল্পনা পাওয়ার পর সরকারের উচিত পোশাকশিল্পের গুরুত্ব বিবেচনা করে কীভাবে এটি গ্রহণ করবে সেটি নির্ধারণ করা। একই সঙ্গে প্রতিশ্রুতিশীল অন্যান্য রপ্তানি খাত যাতে চাপে না পড়ে সেদিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে।

সকালের খবর
১৪ ডিসেম্বর ২০১৪

নারীর কাজের যথার্থ মূল্যায়ন হোক

ফাহমিদা খাতুন

সমকাল: সম্প্রতি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ 'জাতীয় অর্থনীতিতে নারীদের অবদান নিরূপণ: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। গবেষণা পরিচালক হিসেবে আপনি কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছেন। এই গবেষণার মূল ফোকাস কী ছিল?

ফাহমিদা খাতুন: নারীরা যেসব কাজ করে থাকেন ঘরে এবং ঘরের বাইরে, যে কাজগুলোর অর্থনৈতিক স্বীকৃতি নেই, সেই কাজগুলোকে যদি আমরা অর্থনৈতিক মূল্যে পরিমাপ করি, তাহলে তার পরিমাণ কত তা বের করা ছিল গবেষণার উদ্দেশ্য। সেটি জিডিপির সঙ্গে তুলনা করে কত অংশ তা নিরূপণ করা হয়। আমরা জরিপ করে বের করেছি, যে কোনো একটা সাধারণ দিনে নারী ও পুরুষরা কত ঘণ্টা কোন কাজে ব্যয় করেন। তারা যেসব কাজ করেন যার জন্য তারা বেতন পান না, সে ধরনের কাজের অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নীতি-নির্ধারকদের জন্য সুপারিশমালা তৈরি করা হয়েছে। যেহেতু নারীরা ঘরের ভেতরেই বেশিরভাগ কাজ করে থাকেন, যেসব কাজের জন্য তারা স্বীকৃতি পান না, সেজন্য সমাজে ও পরিবারে তাদের মর্যাদা কম থাকে। অনেক সময় তারা সহিংসতার শিকার হন। সহিংসতা রোধে এবং নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নারীর কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন ভূমিকা রাখতে পারে। আরেকটা দিক রয়েছে, আমরা প্রচলিত উপায়ে মোট দেশজ উৎপাদন কিংবা জিডিপি যেভাবে হিসাব করি, তা হলো যেসব পণ্য বা সেবা বাজারে বিক্রি করে তার বিনিময়ে অর্থ পাওয়া যায় সেগুলোই হিসাবের মধ্যে আসে। কিন্তু তার বাইরে অনেক ধরনের কাজ ও সেবা রয়েছে যার বিনিময়ে কোনো অর্থ পাওয়া যায় না, বাজারে

সেগুলো লেনদেন হয় না। সেগুলো জিডিপির মধ্যে হিসাব করা হয় না। সেজন্য আমরা দেখতে পাই, জিডিপিতে নারীর অবদান অনেক কম।

সমকাল: গবেষণাটি কীভাবে পরিচালিত হয়েছে?

ফাহমিদা খাতুন: গবেষণা করতে গিয়ে সারা বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় একটি জরিপ পরিচালনা করেছি। প্রাথমিক তথ্যভিত্তিক এ গবেষণায় ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের মোট ১৩,৪৬০ ব্যক্তির কাজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যাদের মধ্যে নারী ৮,৩২০ জন এবং পুরুষ ৫,৩২০ জন। জরিপের মোট হাউজহোল্ড (খানা) সংখ্যা ৫,৬৭০, যা ৬৪টি জেলার ৩৭৮টি নমুনা একক থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। ২০১৪ সালের মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে এই জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। একটি বিস্তারিত কাঠামোগত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করেই গবেষণাপত্র তৈরি করা হয়েছে।

সমকাল: গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের মূল্যায়নগুলো কী কী?

ফাহমিদা খাতুন: নারীর কাজগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। আমাদের প্রচলিত জিডিপি হিসাব প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা উচিত। জিডিপি হিসাবের যে পদ্ধতি যাকে বলে সিস্টেম অব ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস (এসএনএ), তা জাতিসংঘ নির্ধারিত উপায়েই করা হয়। সেখানে পরিবর্তন আনতে হলে জাতীয়ভাবে নীতিমালায় পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদেরই সেই সুপারিশটা করতে হবে, যাতে ইউএন এসএনএ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়। এর আগে নারীবাদী আন্দোলনকারীরা এসএনএ পদ্ধতিতে পরিবর্তনের দাবি করেছেন। এর প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, দৃষ্টির অগোচরে থাকা কাজগুলোর হিসাব অর্থনৈতিক মূল্যে করা অনেক জটিল। সেই লক্ষ্যে কাজ করতে গেলে আমাদের কয়েকটা ধাপে কাজ করতে হবে। প্রথম ধাপ যেটি জাতিসংঘও বলেছে তা হলো, ‘টাইম ইউজ ডায়েরি’ পদ্ধতি অর্থাৎ দিনে কে কতটুকু কাজ করছেন এবং কোন ধরনের কাজ করছেন। নিয়মিতভাবে এই ‘টাইম ইউজ’ জরিপ করা উচিত, যাতে দেখা যায় কে কীভাবে কাজ করছেন। তারপর যে কাজগুলোর অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হয় না, সেগুলোর অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করে জিডিপি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত না করা গেলেও সমান্তরালভাবে এই হিসাবটা রাখা যেতে পারে। নিয়মিতভাবে জরিপ করে কাজের হিসাব রাখলে আমরা দেখাতে পারব নারীর কাজের অর্থনৈতিক মূল্য কতটুকু। আমরা আমাদের গবেষণায় দুটি পদ্ধতিতে হিসাব করেছি। প্রতিস্থাপন পদ্ধতি অর্থাৎ নারীর এসব কাজ নিজেরা না করে অন্যকে দিয়ে করালে কত খরচ হতো। জিডিপির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে,

এর পরিমাণ জিডিপির প্রায় ৭৬.৮ শতাংশ। অন্যদিকে গ্রহণযোগ্য মূল্য পদ্ধতি অর্থাৎ কাজগুলো কেউ করতে বললে তার পারিশ্রমিক কেমন নেওয়া হবে তার ভিত্তিতে যে হিসাব করা হয়েছে, সেখানেও দেখা যাবে কাজের প্রাক্কলিত বার্ষিক মূল্য জিডিপির প্রায় ৮৭.২ শতাংশের সমপরিমাণ। অর্থাৎ নারীর এই কাজগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করলে আমাদের জিডিপি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তবে এখানে গুলিয়ে ফেলার কোনো অবকাশ নেই যে, এর মাধ্যমে জিডিপির পরিমাণ বেড়ে যাবে। যদি এই কাজগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে সারা পৃথিবীতেই জিডিপির পরিমাণ বেড়ে যাবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, অর্থনীতিতে নারীর অবদান দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় তাদেরকে অবমূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এখানে মানসিকতার একটা পরিবর্তন প্রয়োজন।

সমকাল: বাস্তবতা হলো নারী ঘরের কাজ বেশি করেন, বাইরের কাজ কম করতে পারছেন। তাতে নারীর প্রতিভা ও মেধার বিকাশ ঠিকভাবে ঘটতে পারছে না। এর সমাধান কীভাবে সম্ভব?

ফাহমিদা খাতুন: আমাদের জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ নারী; কিন্তু জিডিপিতে তাদের অবদান ৩০ শতাংশের মতো। একদিকে নারীরা আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে আসছেন না, অন্যদিকে যেসব কাজ করছেন তা নিম্ন মজুরির। নারীদের আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে বেশি করে আনতে হবে। সেজন্য তাদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শহরের মধ্যে অনেকের থাকার ব্যবস্থা নেই। সেজন্য তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। যাতায়াত একটা বড় সমস্যা। সন্তানদের কোথায় রাখবেন তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এছাড়া নিরাপত্তার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপত্তাহীনতার কারণে সন্তানকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া-আসার কাজ মাকেই করতে হয়। সন্ধ্যার পর নারীরা অনেক ধরনের কাজ করতে পারছেন না। বিশেষ করে নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে উদ্যোক্তাদের অনেক ধরনের সমস্যা হয়। অনেক সময় তাদের দোকান আগে থেকেই বন্ধ করতে হয়।

সমকাল: ঘরে-বাইরে নারীদের কাজ করতে না চাওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ আপনার গবেষণায় উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে পরিবারের সদস্যদের আপত্তি, পরিবারকে অধিক সময় দেওয়ার মানসিকতা ইত্যাদি। এর সমাধান কী?

ফাহমিদা খাতুন: এক্ষেত্রে মানসিকতার পরিবর্তন খুব জরুরি। এখানে শ্রমের একটা বিভাজন হয়ে গেছে। আমরা ধরেই নিয়েছি, কিছু কাজ কেবল নারীকেই করতে হবে। ঘরের কাজ পুরুষরা করবেন না, এই মানসিকতার পরিবর্তন আসতে হবে। আমরা

উন্নত বিশ্বে দেখছি, ঘরের কাজগুলোও সমানভাবে পুরুষরা করছেন। সে কারণেই উন্নত বিশ্বের শ্রমবাজারে মেয়েদের অংশগ্রহণ বেশি। প্রত্যেকেই ঘরের কাজের কিছু অংশ করলে মেয়েদের কাজের বোঝা কিছুটা লাঘব হয়। যেসব নারী বাইরে কাজ করেন, তাদের ঘরে এসেও অনেক কাজ করতে হয়। সেজন্য তারা অবসর খুব কম পান।

সমকাল: মানসিকতার পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা কী হতে পারে?

ফাহমিদা খাতুন: স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থায় জেন্ডার-সংবেদনশীলতার বিষয়টি যুক্ত করতে হবে। নারীর ভূমিকা, নারীর কাজকর্ম এগুলোর প্রতি সংবেদনশীলতা বাড়াতে হবে। পাঠ্যক্রমের মধ্যে, শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মিডিয়ার মাধ্যমে সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে। যেসব সংগঠন নারীর অধিকার রক্ষায় কাজ করছে সবাইকেই মানসিকতা পরিবর্তন করার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। মানসিকতার পরিবর্তন না হলে আপনি যতই সুযোগ-সুবিধা দেন না কেন, তার মাধ্যমে প্রকৃত পরিবর্তন আসবে না। নারীরা যাতে বেশি করে আনুষ্ঠানিক খাতে আসতে পারেন তার সুযোগ করে দিতে হবে নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে। গত এক-দুই দশকে অনেক নারী বাইরে এসেছেন, বিশেষ করে তৈরি পোশাকশিল্পে কাজ করছেন। সেসব পরিবারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন এসেছে।

সমকাল: আপনাদের গবেষণায় উঠে এসেছে, নিজে উপার্জন করলেও মাত্র ৫১.৭ শতাংশ নারী নিজের ইচ্ছামতো খরচ করতে পারেন...

ফাহমিদা খাতুন: তার মানেই দেখা যাচ্ছে, এখনও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি। যারা কাজ করছেন তাদের হয় পরিবারের অনুমতি নিতে হয় অথবা পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হয়। একেবারে নিজের ইচ্ছায় খরচের সুযোগ নেই। সেখানেও সামাজিক অগ্রগতির একটা চিত্র পাওয়া যায়।

সমকাল: নারীরা ঘরে ও ঘরের বাইরে কাজ করছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নারী ও শিশুরাই তুলনামূলক বেশি অপুষ্টির শিকার হচ্ছেন। এমনটি কেন?

ফাহমিদা খাতুন: আমরা মনে করে থাকি, নারীর জন্মই হয়েছে আত্মত্যাগের জন্য। ত্যাগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মেয়েরা নিজেরাই অনেক কিছু করে থাকেন। দেখা যায়, স্বেচ্ছায় পরিবারের সবাইকে খাওয়ানোর পর তিনি খাচ্ছেন। শুধু কম খাওয়া নয়, অনেক সময়

চিকিৎসাসেবার দিক দিয়েও নারীরা পিছিয়ে আছেন। অর্থ ব্যয়ের ভয়ে অনেক নারী অসুস্থতার কথা পরিবারের সদস্যদের জানতে দিচ্ছেন না। এর ফলে সঠিকভাবে তাদের চিকিৎসাও হয় না। সেজন্যই নারীরা যত বেশি আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণগুলো ততই কমবে। সব কিছু তো আর আইনের মধ্যে লেখা থাকে না।

সমকাল: এত কাজ করার পরেও নারী নির্যাতিত হচ্ছে ঘরে ও ঘরের বাইরে। গবেষণায় দেখা গেছে, নারীর প্রতি সহিংসতার কারণে অর্থনীতিরও ক্ষতি হয়। এ সমস্যার সমাধান কীভাবে সম্ভব?

ফাহমিদা খাতুন: আমরা এর আগে নারীর প্রতি যে সহিংসতা হচ্ছে তার অর্থনৈতিক ক্ষতি নিরূপণে একটি গবেষণা করেছিলাম। তাতে দেখা গেছে, এই ক্ষতির পরিমাণ জিডিপির ২ শতাংশের বেশি। যখন নারীর প্রতি সহিংসতা হয়, তখন তিনি কাজে যেতে পারেন না, ছুটি নিতে হয়; সহিংসতা ভয়াবহ হলে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, তার জন্য খরচ হয়; আরও বেশি ভয়াবহ হলে তারা সালিশ করেন। সালিশের জন্য অর্থ খরচ হয়। আদালতের আশ্রয় নিতে গেলেও টাকার প্রয়োজন হয়। নারীরা তাদের অধিকারের বিষয়ে আরও সচেতন হলে এবং আমাদের সমাজে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটলে সহিংসতা কমে আসবে। এর জন্য নারীর কাজগুলোর অর্থনৈতিক মূল্য নিরূপণের মাধ্যমে তাদের অবদানের বিষয়টি আরও স্পষ্ট করতে হবে। তবে এরপরেও সহিংসতা হয়ে থাকে। সহিংসতার ব্যাপারে আইন রয়েছে, সেই আইনের বাস্তবায়ন করা উচিত। সেজন্য মানবাধিকার সংস্থা, নারী অধিকার সংস্থাগুলো আইনি প্রক্রিয়ার ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে।

সমকাল: নীতি-নির্ধারকদের প্রতি আপনাদের সুপারিশগুলো কী কী?

ফাহমিদা খাতুন: নারীদের কেবল ঘরের চার দেয়ালে না রেখে আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে বেশি করে আনতে হবে। যাতে করে আয়-বর্ধনমূলক কাজে জড়িত থেকে আয় করতে পারে। অনেকে ঘরের দায়িত্বের কারণে বাইরে কাজ করতে পারেন না। সেজন্য আমরা বলছি, কিছু কিছু সাহায্য সরকার থেকে আসতে পারে। যেমন, বাচ্চাদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার তৈরি করা কিংবা কর্মজীবী নারীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া। এ ধরনের কিছু সুযোগ-সুবিধা সরকার এবং ব্যক্তিখাত থেকে তৈরি করা গেলে বাইরের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করা নারীদের জন্য সুবিধাজনক হবে। তাহলে প্রচলিত পদ্ধতির জিডিপিতে নারীর অবদানও বাড়বে। শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করার জন্য দক্ষতা

বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো প্রয়োজন। অর্থাৎ এখানে দুই ধরনের কাজ সমান্তরালভাবে করতে হবে। একদিকে আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য দক্ষতা, শিক্ষা, সরকার থেকে সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে; আরেকটি তাদের অস্বীকৃত কাজের মূল্যায়ন করার জন্য নিয়মিতভাবে জরিপ করে অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এই অর্থনৈতিক মূল্যকে জিডিপি হিসাবের মধ্যে সংযুক্ত করতে হলে জাতীয়ভাবে করতে হবে। কীভাবে করা যায় তা নির্ধারণে অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, অ্যাডভোকেসি গ্রুপসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বয়ে সরকার একটি কমিটি গঠন করতে পারে। জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের হিসাব কম আসার একটি অন্যতম কারণ হলো, কর্মক্ষেত্রে নারীর মজুরি তুলনামূলকভাবে কম। এ বৈষম্য দূর করতে সরকারের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন করা উচিত। এর মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক অবদান আরও যথাযথভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

সমকাল
২৯ অক্টোবর ২০১৪

সাক্ষাৎকার: একরামুল হক শামীম

পরিবর্তনশীল শ্রমবাজারের নিরীখে গতিশীল ট্রেড ইউনিয়ন: কিছু নির্বাচিত ভাবনা

মোস্তাফিজুর রহমান

প্রতি বছর প্রায় বিশ লাখ মানুষ বাংলাদেশের শ্রমবাজারে প্রবেশ করেন। কৃষি খাতে বর্তমানে শ্রমশক্তির শতকরা ৪৬ ভাগ নিয়োজিত, কিন্তু শ্রমবাজারে নতুন অন্তর্ভুক্তির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই যাচ্ছেন সেবা খাত ও শিল্প খাতে। তাদের একটা বড় অংশ আবার যোগ দিচ্ছেন বিভিন্ন অসংগঠিত বা ইনফর্মাল কার্যক্রমে। বাংলাদেশের শিল্প খাতে তৈরি পোশাক খাতের প্রাধান্যের কারণে মহিলা শ্রমিকদের অধিক অংশগ্রহণের (ফেমিনাইজেশন) বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য। শ্রমবাজারের এ বৈচিত্র্যের কারণে বাংলাদেশের শ্রমিকদের শ্রেণীভিত্তিক প্রধান প্রধান দাবি-দাওয়ার সাথে সাথে পেশাভিত্তিক ও খাত-নির্দিষ্ট দাবি-দাওয়া ও প্রয়োজনের বৈচিত্র্যও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে দৃশ্যমান এসব প্রবণতা বৈশ্বিক চলমান প্রবণতার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ বটে; যেখানে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া, বাজার অর্থনীতি, বাণিজ্য উদারীকরণ, বিরাষ্ট্রীয়করণ ও ব্যক্তি খাতের বিকাশের সাথে সমান্তরালভাবে শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলনের চাহিদাও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দেশে ও বিদেশে এসব প্রবণতাসমূহ শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতির জন্ম দিচ্ছে; নানান ধরনের সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা ও বাধার সৃষ্টি করছে; এবং শ্রমিক আন্দোলনের সম্ভাবনা ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের পরিবেশ ও কার্যকারিতার ওপর গুরুত্বপূর্ণ অভিঘাত রাখছে। পরিবর্তনশীল এ বাস্তবতার নিরীখে শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রম ও নেতৃত্বমূলক ভূমিকার বিষয়ে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসছে। ফলশ্রুতিতে, অর্থনীতির কাঠামোগত বিবর্তন ও শ্রমবাজারের বিকাশমান পরিবর্তনকে বিবেচনায় নিয়েই আগামী দিনের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে অগ্রসর হতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কনভেনশনের অনেকগুলো ধারাতেই বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। এসব কনভেনশনে বাংলাদেশের শ্রমিকদের বিভিন্ন অধিকার স্বীকৃত। নতুন পরিবর্তিত ও সংশোধিত শ্রম আইনে শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু দাবির প্রতিফলন হয়নি; আবার বেশ কিছু দাবি স্বীকৃত ও প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু যা স্বীকৃত হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য যেসব প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, বিধি-বিধান ও বাস্তবায়ন নিরীক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক যে সক্ষমতা প্রয়োজন তার অভাব অনেক ক্ষেত্রেই বেশ প্রকটভাবে উপস্থিত। শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আরও সোচ্চার হবার প্রয়োজন রয়েছে। শ্রমিক সংগঠনগুলো মূল মূল অধিকার ও কনভেনশনের আলোকে 'রিপোর্ট কার্ড' প্রস্তুত করে সরকারের ও স্বার্থসংশ্লিষ্টদের নজরে আনতে পারেন এবং আন্দোলনের যৌক্তিক ভিত্তি হিসেবে তা প্রয়োজনমাফিক ব্যবহার করতে পারেন।

ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার। পরিতাপের বিষয় এই যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ট্রেড ইউনিয়নের যে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নিয়ে আমরা গর্ব করি, তা অনেকাংশেই তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না। যেমন, বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী যেসব কারখানায় ন্যূনতম একশ জন শ্রমিক কাজ করেন বা যেসব কারখানার মোট সম্পদ এক কোটি টাকার বেশি সেসব কারখানায় শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য 'পার্টিসিপেটরি ফান্ড' ও 'ওয়েলফেয়ার ফান্ড' করার কথা; এছাড়াও, শ্রমিকদের মাঝে নীট মুনাফার পাঁচ ভাগ বণ্টন করতে হবে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর নিহত শ্রমিকদের পরিবারগুলোর ক্ষতিপূরণের জন্য সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এসব নীতি বা সিদ্ধান্ত যখন বাস্তবায়িত না হয়, তখন শ্রমিক সংগঠনগুলোর দায়িত্ব থাকে এগুলোর বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এসব বিষয়ে ধারাবাহিক উদ্যোগ দেখা যায় না। শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী করতে হলে ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে হবে।

সারা বিশ্বে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা নিম্নাভিমুখী; দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতা বাস্তব সত্য। অল্প সংখ্যক শ্রমিকই কালেক্টিভ বার্গেনিংয়ের মাধ্যমে মজুরি ইত্যাদিতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন। সংগঠিতভাবে আলোচনায় যারা অংশগ্রহণ করতে পারছেন না, তারা শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি, মালিক পক্ষের নেতিবাচক মনোভাব, শ্রমবাজারের কাঠামো, উৎপাদন কাঠামোর নবতর বিন্যাস ইত্যাদিসহ মহিলা শ্রমিকদের বাজারে অন্তর্ভুক্তি, বৈশ্বিক উৎপাদন নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি ও প্রসার – শ্রমবাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংগঠিত হচ্ছে, আবার নতুন শক্তি-ভারসাম্যেরও সৃষ্টি হচ্ছে।

একবিংশ শতাব্দীর শ্রমিক আন্দোলনকে এগুলোর বিবেচনায় নিয়ে নতুন ধারার কৌশল, শক্তি-সমন্বয় ও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

লিখিত চুক্তি, চাকরিতে যোগদানপত্র প্রদান, ঝুঁকিবিহীন কর্মপরিবেশ, শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগসহ শ্রমিকদের অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের পরিস্থিতি ও অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও তার প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন যখন তার অপরিহার্যতা প্রমাণ করতে পারে, তখন শ্রমিকদেরকেও ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে নির্লিপ্ততা থেকে মনোযোগ, ও মনোযোগ থেকে উৎসাহ ও আগ্রহের দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। অর্থনীতির সংগঠিত (ফর্মাল) ও অসংগঠিত (ইনফর্মাল) উভয় খাতেই ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে এসব কার্যক্রমগুলো শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

ন্যূনতম মজুরির বিষয়টি শ্রমিক অধিকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। এক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত উদ্যোগ নয়, প্রয়োজন পরিকল্পিত ও সমন্বিত উদ্যোগের। এটা শুধু তৈরি পোশাক খাত নয়, সব খাতের জন্যই একটি মৌলিক অধিকারের বিষয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন সেক্টরের জন্য ন্যূনতম মজুরি আলাদাভাবে নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া চলমান। এক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের যদি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকে তাহলে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতার সাথে তা করা সম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ন্যূনতম মজুরির 'ফ্লোর' নির্ধারিত হয়। দারিদ্র্যসীমার নিরীখে প্রযোজ্য আয়, সংশ্লিষ্ট দেশে জীবনযাত্রার গড় মান, শ্রমিক পরিবারের সদস্য সংখ্যা ও ব্যয়-কাঠামো ইত্যাদিকে বিবেচনায় নিয়ে তা করা হয়ে থাকে। বর্তমানে 'ডিসেন্ট লিভিং' ধারণাটিও আলোচনায় চলে এসেছে যা অনুসারে শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্মানজনকভাবে জীবন ধারণের উপযোগী একটি আয়ের কথা ক্রমান্বয়ে স্বীকৃত হচ্ছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উন্নততর মানের উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে ডিসেন্ট ওয়েজের দিকে অগ্রসর হতে হবে। এখানে উদ্যোক্তা সমাজের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে, তেমনি সরকারের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় নীতি সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন আছে। শ্রমিকরা দেশের বাস্তবতার বাইরে নন, এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সঙ্গতিপূর্ণভাবেই তাদের মজুরি ও সুবিধাদির বিষয়টি দেখতে হবে – এটা যৌক্তিক কথা। কিন্তু তাদেরকে যখন যথাযথ প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয় তখনই অন্যায্যতার প্রশ্নটি উঠে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ন্যূনতম মজুরির উদাহরণ দিয়ে এটা বিশ্লেষণ করা যায়। ১৯৯৪ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি পোশাক খাতে প্রকৃত ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি পায় মাত্র শতকরা ৪ ভাগ, যেখানে বাংলাদেশের প্রকৃত জাতীয় আয় এ সময়কালে বেড়েছিল ৭০ ভাগেরও বেশি। এটা ছিল একটা বড় ধরনের অন্যায়, যা স্বাভাবিকভাবেই অসন্তোষের জন্ম

দেয়। এ কথা বলতে হবে যে, কেবলমাত্র ২০১০ সালে তৈরি পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি যখন ১,৬৬২ টাকা থেকে ৩,০০০ টাকা নির্ধারিত হয়, এবং ২০১৩ সালে তা ৫,৩০০ টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়, তখনি কেবল জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির সাথে ন্যূনতম মজুরির সামঞ্জস্য বিধানের একটি পরিকল্পিত প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। ২০১০ সালে ঢাকা শহরে মাথাপিছু দারিদ্র্যসীমা ছিল প্রতি মাসে ২,০৩০ টাকা; গড়ে বাংলাদেশে নির্ভরশীলতার হার (পরিবারের একজন কর্মরত মানুষের ওপর গড়ে কত জন পরিবারের সদস্য নির্ভরশীল) যা আছে তা যদি কমিয়ে ন্যূনতম একজনও ধরা হয়, তাহলেও ২০১০ সালে তৈরি পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরি (৩,০০০ টাকা প্রতি মাসে) ছিল দারিদ্র্যসীমার (দুই জনের জন্য যা ৪,০৬০ টাকা প্রতি মাসে) নিচে। মূল্যস্ফীতি ও তার ফলশ্রুতিতে পরিবর্তিত দারিদ্র্যসীমা বিবেচনায় নিলে ২০১৩ সালের ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে এ অবস্থার কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন হলেও দারিদ্র্যসীমার নিরীখে দৃশ্যমান পরিবর্তন হয়নি। একজন খেটে খাওয়া মানুষকে দারিদ্র্যসীমার উপরে টেকসইভাবে নেওয়ার জন্য উন্নততর জীবনযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সুবিধাগুলো প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ন্যূনতম মজুরি এসব বিবেচনার নিরীখেই নির্ধারণ করতে হবে।

এক সময় আবাসন, সন্তানদের পড়াশুনার জন্য স্কুল, বিনোদন, এসব শ্রমিকদের স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হতো, অন্তত শিল্পাঞ্চল এলাকাগুলোতে। এখন এসব বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় 'জোনিং' ধারণাটি এখন আলোচিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শ্রমিকদের মজুরি-বহির্ভূত সুযোগ-সুবিধাদির বিষয়গুলোও পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার ও মালিক উভয়ের অংশীদারিত্বের প্রয়োজন হবে, এবং ট্রেড ইউনিয়নকে এসব বিষয়ে সোচ্চার হতে হবে।

অনেক সময়ই শোনা যায় যে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা না গেলে শ্রমিকদেরকে ভালো মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজনমাফিক দেওয়া সম্ভব না। এ কথার মধ্যে সত্যতা আছে। কিন্তু এটা কার্যকারণ বা অজুহাত দুই ভাবেই উপস্থাপন করা যায়। একটা কৌশল হতে পারে, শ্রমিকদের পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, এবং তার ফলশ্রুতিতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয়ের যথোপযুক্ত অংশ তাদের মজুরি ও সুবিধাদিতে ব্যয় করার লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা। তা না করে শুধু উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনের কথা বলে ও কিছু না করে শ্রমিকদের 'নিম্ন উৎপাদনশীলতা-নিম্ন মজুরি'-র দুষ্টচক্রে আবদ্ধ রেখে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কৌশল গ্রহণ করলে তা নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ যাতে শ্রমিক

পেতে পারেন, রাষ্ট্র ও উদ্যোক্তা যাতে তার ব্যবস্থা করেন, শ্রমিকরা যাতে দক্ষতা বৃদ্ধি করে ভালো মজুরি পাবার সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন এটা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের একটা বড় ভূমিকা থাকতে হবে। শিল্প ও সেবা খাতের বিকাশের বর্তমান প্রবণতার প্রেক্ষাপটে এ দিকটাতে ট্রেড ইউনিয়নকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি আয় ২০২১ সালের মধ্যে পঁচিশ বিলিয়ন থেকে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ঘোষিত হয়েছে। রানা প্লাজার মর্মান্তিক দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপটে শ্রমিক অধিকার, কর্মপরিবেশ, শ্রমিক নিরাপত্তা, ভালো মজুরির নিশ্চয়তা – এসব ইস্যু এখন সামনে চলে এসেছে। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা ও শ্রমিক শ্রেণী একটি অভিন্ন কৌশলের অংশ হিসেবে এ ধরনের টার্গেট বাস্তবায়নে অংশীদার হতে পারেন যেখানে মজুরি ও উন্নততর কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তা একটি অন্যতম কৌশল হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্স উদ্যোগ ইতিবাচক, কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে দেখতে হবে মধ্য-দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষাপটে যখন ক্রেতা-নির্ভর উদ্যোগগুলো আর অব্যাহত থাকবে না (অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্স একটি পাঁচ বছর মেয়াদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আওতায় কাজ করছে) আর শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও তাগিদ আগামীতেও থেকে যাবে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এখন থেকেই।

উৎপাদনের বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনে শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হলে ভ্যালু চেইনের সাথে সংশ্লিষ্ট সব দেশের শ্রমিকদের সহমর্মিতা, একাত্মবোধ ও সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। সে প্রেক্ষিত থেকে শ্রমিক আন্দোলনের দেশীয় পর্যায়ের সাথে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নিকট যোগসূত্র ও কার্যকর সাংগঠনিক যোগাযোগ জরুরি। বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়নকে এ ব্যপারে আগ্রহী ও উদ্যমী হতে হবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে গ্রামীণ অর্থনীতিতেও বড় পরিবর্তন সংগঠিত হচ্ছে; কৃষি ও কৃষি-বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের (খামার, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিভিন্ন সেবা খাত) ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছে। এসব খাতেও শ্রমিক ও কর্মজীবিদের সংগঠিত করে তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠার তাগিদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শ্রমবাজারে নতুন যারা আসছেন তাদের ২০-২৫ ভাগ বৈশ্বিক শ্রমবাজারে যাচ্ছেন অভিবাসী শ্রমিক ও কর্মী হিসেবে। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য ও উন্নত দেশসমূহে এ সংখ্যা এক কোটির কাছাকাছি। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার

বিষয়টিকেও গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। যেসব দেশে বাংলাদেশের শ্রমিকরা আছেন সেসব দেশের আইনে এবং আইএলও ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কনভেনশনে প্রদত্ত অধিকার থেকে তারা যাতে বঞ্চিত না হন, সেটা দেখার দায়িত্ব শুধু বাংলাদেশ সরকারের নয়। বর্তমানে কলম্বো প্রসেসসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বেশ কিছু ধারার সাথে বাংলাদেশের সংশ্লেষ আছে। এগুলোতে সক্রিয় ভূমিকা রাখার পাশাপাশি অভিবাসী শ্রমিকরা যেসব দেশে কর্মরত সেসব দেশের নিয়ম-নীতির প্রেক্ষিতে শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও মজুরি-বেতনের বিষয়গুলোতে শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলোর আরও উদ্যোগী ভূমিকার প্রয়োজন আছে।

বাংলাদেশের প্রগতিশীল শ্রমিক আন্দোলনের একটি বৈশ্বিক সংশ্লেষ ও আত্মিক সংযোগ সবসময়ই ছিল। বর্তমানে পরিবর্তিত বৈশ্বিক শক্তি ভারসাম্যের কারণে এ সংযোগ ও সহমর্মিতা অনেকটাই দুর্বল। কিন্তু উৎপাদন কাঠামো, ভ্যালু চেইন, উৎপাদন নেটওয়ার্কের বিকাশ, আউট সোর্সিং (অর্থাৎ এক দেশ থেকে আরেক দেশে উৎপাদন স্থানান্তর) ইত্যাদির বিকাশমান পরিবর্তন ও বিন্যাসের কারণে একবিংশ শতাব্দীতে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা বৈশ্বিক পর্যায়ে কী হতে পারে ও কী হওয়া উচিত তা নিয়ে ভাবতে হবে। বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের আউট সোর্সিং স্ট্র্যাটেজির কারণে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শ্রমিক স্বার্থের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। উন্নত দেশের শ্রমিকদের মজুরি কমানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এই বলে যে তা না হলে উন্নয়নশীল দেশে কম শ্রমমূল্যের সুবাদে সেখানে উৎপাদন ইউনিট/কারখানা স্থানান্তর করা হবে। অন্যদিকে, উন্নয়নশীল দেশগুলো আবার এ ধরনের বিনিয়োগ আকর্ষণে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে স্বভাবতই আগ্রহী, এবং সে কারণে স্বল্প মজুরিতে সহজলভ্য শ্রম সরবরাহকে তাদের দেশের তূলনামূলক সুবিধা হিসেবে দেখাতে তারা সদা সচেষ্ট। উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের শ্রমিক সমাজের স্বার্থের এ আপাত বৈরী অবস্থান ও সংঘাত শ্রমিকদের শ্রেণীগত অভিন্ন স্বার্থকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এ বিষয়টি নিয়েও ভাবতে হবে; সকল দেশের শ্রমিকদের অভিন্ন স্বার্থের বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে আসা ও অভিন্ন কৌশল নির্ধারণের কাজটিকে গুরুত্ব দিতে হবে। বৈশ্বিক পর্যায়ে 'ডিসেন্ট ওয়েজ' বা 'ফ্লোর ওয়েজ'-এর ধারণাগুলিকে সামনে নিয়ে আসা এবং চলমান এসব চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনকে বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে একটি আলোকিত ও অগ্রসরাভিমুখী ভূমিকা রাখতে হবে।

এখানে স্মর্তব্য যে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিংশ শতাব্দীতে দেশে দেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে যা শুধু শ্রমিক স্বার্থ সুরক্ষায় নয়, দেশে

দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও রাজনৈতিক আন্দোলনেও বড় ভূমিকা রেখেছে। আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনও এ নিয়ে গর্ব করতে পারে। একই সাথে বর্তমান বাস্তবতা হলো এই যে, একবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে তা একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতার নিরীখেই করতে হবে, আর একই সাথে নতুন বাস্তবতা সৃষ্টিতেও তাকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। এ দ্বিবিধ চ্যালেঞ্জকে ধারণ করে শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা ও শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্য একটি কঠিন দায়িত্ব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

শ্রমিকরা যখন উপলব্ধি করেন যে ট্রেড ইউনিয়ন তাদের স্বার্থ রক্ষা করছে এবং মালিকের অন্যায্য পদক্ষেপ থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে সচেষ্ট তখন সংগঠিত হবার দিকে তাদের আগ্রহ বাড়ে। সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ যখন তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সমর্থ হয় না, তখন ট্রেড ইউনিয়নকে শ্রমিকরা তাদের শক্তির ধারক হিসেবে দেখে যার মাধ্যমে সেসব প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। কিন্তু, যারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে জড়িত, তারা জানেন এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয় না, এবং এর জন্য ধারাবাহিক সাংগঠনিক সক্রিয়তা ও উদ্যম-উদ্যোগের প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রগতিশীল শ্রমিক আন্দোলনের এক্ষেত্রে রয়েছে ব্যাপক অভিজ্ঞতা। সে ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নে, শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায়, গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রগতিশীল শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আগামীতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে – এ প্রত্যয় আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে, আশান্বিত করে।

স্মরণিকা
৯ম জাতীয় সম্মেলন, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
নভেম্বর ২০১৪

অধ্যায় ৪

রানা প্লাজা

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার নয় মাস: প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কত দূর?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার নয় মাস পার হয়েছে। পৃথিবীর শিল্প ইতিহাসের অন্যতম শোচনীয় এ দুর্ঘটনায় ১,১৩৪ জন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছে, কয়েকশত শ্রমিক আহত হয়েছে আর অনেকে এখনও নিখোঁজ রয়েছে। দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে সরকারের উচ্চপর্যায়, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উদ্ধারকর্মী, এবং সাহায্যকারী সকলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিহত ও আহত শ্রমিকদের উদ্ধারে। এর ফলে প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্ধারকাজ মোটামুটি প্রত্যাশিত মাত্রায় শেষ করা গিয়েছিল। সেসময় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংগঠন বিভিন্ন আর্থিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন – মৃত শ্রমিকদের পরিবারের কল্যাণে, আহত শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনে, চিকিৎসার জন্য এবং এতিম শিশুদের জন্য। সেসব প্রতিশ্রুতির কিছু পূরণও হয়েছে। কিন্তু দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরের এসব উদ্যোগে সাময়িক প্রতিকার হয়তো হয়েছে, কিন্তু শ্রমিকের প্রয়োজন তাতে মেটেনি। আজ নয় মাস পর এসব শ্রমিকদের বা তাদের আত্মীয়দের সাথে কথা বলে বুঝতে পারছি শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনের বিষয়গুলো সুরাহা না হওয়ায় তারা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। বর্তমান নিবন্ধে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করছি।

দুর্ঘটনার শিকার মোট কতজন?

আজ নয় মাস পরও পুরোপুরি জানা যায়নি মোট কত জন রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, কতজন আহত হয়েছেন অথবা কতজনের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো কোনো হিসাবে দুর্ঘটনার শিকার ৩,৫৭২ জন; আবার কোনো কোনো হিসাবে এটা ৩,৮৩৮

জন। দুর্ঘটনা থেকে উদ্ধার পেয়েছেন এমন শ্রমিকের সংখ্যা কোনো হিসাবে ২,৪৩৮ জন আবার কোনো হিসাবে ২,৫১৫ জন। পরিবারের সদস্যরা ‘নিখোঁজ’ রয়েছেন এমন শ্রমিকের সংখ্যা প্রাথমিক হিসাবে ছিল ৩৩২, পরবর্তীতে স্থানীয় তদারককারী কর্তৃপক্ষ ২৬৭ জনের তথ্য দিয়েছেন। অন্যান্য হিসাবে এ সংখ্যা আরও বেশি। সম্প্রতি অজ্ঞাত ১৫৭ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে DNA পরীক্ষা এবং পরিচয় মিলিয়ে দেখার মাধ্যমে। প্রশ্ন হলো – ‘অজ্ঞাত’ পরিচয়ে দাফন করা মৃত ব্যক্তিদের বাকি ১১০ জন কারা?

শ্রমিকরা বিভিন্ন প্রকার আঘাতে আহত হয়েছেন – কারও অঙ্গহানি হয়েছে, কেউ মেরুদণ্ডজনিত আঘাত এবং কেউবা মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। এসব আহত শ্রমিকদের প্রকারভেদে সংখ্যা জানা প্রয়োজন। সংখ্যাগত এ পার্থক্যের কারণে প্রকৃত দুর্ঘটনার শিকার অনেক শ্রমিক এবং তাদের পরিবার আইনগত সুবিধাদি থেকে, সরকারি-বেসরকারি সাহায্য থেকে এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। এর ফলে তাদের জীবনের গতিই হয়তো পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। বর্তমানে সাহায্য-সহযোগিতার যে উদ্যোগ চলছে – সেসব বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিকদের সংখ্যা জানা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের উদ্যোগে জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কমিটি এ তথ্যগত জটিলতা দূর করতে পারে।

প্রতিশ্রুত সাহায্য প্রদান পরিস্থিতি

দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে বিভিন্ন পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এসেছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে ৭৭৭ জন মৃত শ্রমিকের সৎকারের জন্য পরিবার প্রতি ২০,০০০ টাকা করে এবং এককালীন ১ লাখ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। বিজিএমইএ ২,৭৮৫ জন শ্রমিকের বেতন-ভাতা বাবদ ৭.০৬ কোটি টাকা দিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন থেকে শ্রমিক প্রতি ৫,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান প্রাইমার্ক, দুই দফায় শ্রমিকদের ছয় মাসের মূল মজুরি বাবদ অর্থ প্রদান করেছে। এর বাইরে প্রথম আলো সহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গ সাহায্য প্রদান করেছে। এসব আশু পদক্ষেপ সাময়িক প্রয়োজন মেটালেও দীর্ঘমেয়াদি সহায়তার প্রতিশ্রুতি এখনও পূরণ হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিক ও পরিবারগুলোর জন্য প্রকারভেদে ১০-১৫ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র দেওয়ার কথা। এ পর্যন্ত পেয়েছেন মাত্র ৪০ জন। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সহায়তার অভাবে আজ এসব হতভাগ্য শ্রমিকের পরিবার, আহত শ্রমিক এবং হারানো শ্রমিকের পরিবার অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনাতিপাত করছে।

এ মুহূর্তে উচ্চ আদালতের নির্দেশনায় দেশে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ হিসাব করার একটি উদ্যোগ চলছে। এতে ক্ষতিপূরণ বাবদ মৃত শ্রমিকের পরিবারকে ১৪.৫ লাখ টাকা করে এবং অঙ্গহানি হওয়া শ্রমিককে ৭.৫ লাখ টাকা করে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ক্ষতিপূরণটুকু পেলেও শ্রমিকদের কিছুটা আর্থিক সংস্থান হতো। কিন্তু শ্রমিকদের ক্ষতির হিসাব নিয়ে বিভিন্ন পক্ষ ঐকমত্যে না পৌঁছানোর ফলে এ প্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রতায় পড়েছে। আন্তর্জাতিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে চারটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান – প্রাইমার্ক, লবল, বোনমার্ক এবং এলকোর্টে মিলে শ্রমিকদের সহায়তা তহবিলে ৩২০ কোটি টাকা দিতে সম্মত হয়েছে। বর্তমানে এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রাথমিক কাজ চলছে। দুঃখজনক হলো দেশীয় পর্যায়ে এ উদ্যোগে অংশ নিতে কোনো পক্ষ এখনও এগিয়ে আসেনি।

আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসা

দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে আহত শ্রমিকদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য স্থানীয় হাসপাতাল, ক্লিনিক বিশেষত এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, পঙ্গু হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং সিআরপি হাসপাতাল কাজ করেছে। পরবর্তীতে আহত শ্রমিকরা বিভিন্ন স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছে এবং এখনও নিচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হলেও পরবর্তীতে অনেক শ্রমিককে উচ্চব্যয়ে চিকিৎসা করাতে হয়েছে এবং এখনও করাতে হচ্ছে। বিল্স্, সাভার সিআরপি এবং সিডিডি-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় পর্যায়ে শ্রমিকদের বিনামূল্যে/স্বল্প খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। এসব উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অনেক আহত শ্রমিকের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা প্রয়োজন। আশার কথা যাদের অঙ্গহানি হয়েছে এমন ৩৯ জনকে অঙ্গদান করা হয়েছে। কিন্তু এসব কৃত্রিম অঙ্গ দিয়ে ন্যূনতম দৈনন্দিন কাজ চললেও কারখানায় কাজ চালানোর জন্য তা উপযোগী নয়। আবার এসব কৃত্রিম অঙ্গ পুনঃস্থাপনের প্রয়োজন হয় দু-তিন বছর পর পর। ফলে প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে ভালো হলেও বাস্তবভিত্তিক এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনের নিরীখে শ্রমিকদের অঙ্গ পুনঃস্থাপনের বিষয়টি নজরে রাখা দরকার। দেখা যাচ্ছে চিকিৎসাজনিত কর্মকাণ্ড অধিকাংশই ঢাকা এবং সাভারকেন্দ্রিক – ফলে এখানে বসবাসরত শ্রমিকরাই এ সুবিধা বেশি পাচ্ছে। কিন্তু আহত শ্রমিকদের অনেকের পক্ষে উচ্চব্যয়ে এসব জায়গায় বসবাস করা কষ্টকর হওয়ায় গ্রামে চলে গেছেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের অনেকেই এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দীর্ঘমেয়াদে আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি।

শ্রমিকদের পুনর্বাসন/পুনর্নিয়োগ

দুর্ঘটনার পর বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের পুনরায় কাজে ফিরে যাওয়া এক বড় চ্যালেঞ্জ। জরিপে দেখা গেছে, দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের একটি বড় অংশ আর গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করতে আগ্রহী নয়। তাদের অনেকে এখনও শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থির অবস্থায় নেই। এ পর্যন্ত বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে স্বল্পসংখ্যক শ্রমিকের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা গেছে, যেমন সরকার প্রতিশ্রুত ১০০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩২ জনকে চামড়া শিল্প কারখানায় নিয়োগের জন্য আইএলও প্রশিক্ষণ দিয়েছে। বিজিএমইএ ৭০ জন শ্রমিককে বিভিন্ন কারখানায় পুনর্নিয়োগ করেছে। বিল্স্ ১০ জন শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। জার্মানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জিআইজেড ৩০০ জন দুর্ঘটনার শিকার মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং কাজের ব্যবস্থা করেছে। এসব উদ্যোগের সাথে সরকারের নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জড়িত রয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার বিপুল সংখ্যক শ্রমিক এখনও কাজে যোগদান করতে পারেননি বা যোগদানের জন্য উপযোগী অবস্থায় পৌঁছাননি। ফলে শ্রমিকদের কর্মক্ষম অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে কাজের ব্যবস্থা করা আগামী দিনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

এতিম শিশুদের অবস্থা

দুর্ঘটনার শিকার এতিম শিশুর সংখ্যা প্রায় ৭০০। উপযুক্ত পরিবেশ এবং সহায়তা না পেলে এসব শিশুর ভবিষ্যত মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে। এক্ষেত্রে বিজিএমইএ ২৮৫ জন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিয়েছিল ২১ বছর পর্যন্ত তাদের সকল দৈনন্দিন, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি খরচ বহন করার জন্য। কিন্তু জানা গেছে মাত্র ৩০ জন এতিম শিশু নিজেদের আত্মীয় পরিজন ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে রাজী হয়েছে। ফলে বাকি শিশুদের ব্যাপার বিজিএমইএ কী করেছে তা জানা দরকার। 'শ্রীপুর' গ্রামে বিদেশি সহায়তায় ১৩৮ জন শিশুর সার্বিক ভরণ-পোষণ, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আহসানিয়া মিশন, অ্যাকশন এইড, ভার্ক এবং ইউনিসেফসহ বিভিন্ন সংস্থা সহায়তা দিচ্ছে শিশুদের। তারপরও অনেক শিশু সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

আইনগত বিষয়ে অগ্রগতি

দুর্ঘটনার পর বিভিন্ন তদন্ত রিপোর্টের সুপারিশের প্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন মহলের চাপে দুর্ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ২২ জনের বিরুদ্ধে চারটি কেস করা হয়েছিল। সে অনুযায়ী

সকলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সিআইডি এখনও তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে পারেনি। বলা হচ্ছে, ৬০০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও তদন্ত রিপোর্ট জমা না দেওয়ায় দীর্ঘসূত্রতার লক্ষণ স্পষ্ট। এরই মাঝে দুইজন জামিনে মুক্তি পেয়ে গেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে তাজরীন গার্মেন্টসে অগ্নি দুর্ঘটনার অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিক মৃত্যুকে অপরাধ হিসেবে রায় দেওয়াকে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

উদ্ধারকারীদের অবস্থা

দুর্ঘটনার অব্যবহিত পর থেকে প্রশিক্ষিত উদ্ধারকর্মীদের পাশাপাশি ১৫০ জন অপ্রশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ উদ্ধারকারীরা উদ্ধার কাজে নিজেদের আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করেছেন। তাদের উদ্যোগকে সকলে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনভিজ্ঞতার জন্য পরবর্তীতে এদের অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন – তাদের অনেকে এখনও সুস্থ হতে পারেননি। অনেক উদ্ধারকর্মী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছেন। এসব উদ্ধারকর্মীর বেশিরভাগ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা কার্যক্রমের বাইরেই থেকে গেছেন। বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা তাদের সহায়তা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন। তবে তাদের দীর্ঘমেয়াদি শুশ্রূষা এবং পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।

সার্বিক বিবেচনায়, রানা প্লাজার হতভাগ্য শ্রমিক ও অন্যান্যদের জন্য প্রথম ১০০ দিনের যে আশু উদ্যোগ এবং ত্বরিত তৎপরতা দেখা গিয়েছিল, তার ধারাবাহিকতা পরবর্তীকালে অনেক ক্ষেত্রে ধরে রাখা যায়নি। শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সহায়তা এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত হয়নি। দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার বিষয়টিও পুরোপুরি অনিশ্চিত। বর্তমানে সাহায্য-সহযোগিতার অনেক ‘ক্ষুদ্র’ ‘ক্ষুদ্র’ উদ্যোগ চলছে। সমস্যা হলো – এসব ক্ষুদ্র উদ্যোগের সমষ্টি বৃহৎ প্রয়োজনকে এখনও স্পর্শ করতে পারেনি। এক্ষেত্রে প্রয়োজন এমন উদ্যোগ – যেখানে সকল মৃত শ্রমিকের পরিবার, সকল আহত শ্রমিক, সকল কর্মহীন শ্রমিক, সকল অনাথ এতিম শিশু এবং উদ্ধারকর্মী যাদের সহায়তা প্রয়োজন এবং যেসব পরিবার এখনও তাদের সন্তান/আত্মীয়কে খুঁজে পাননি – সকলে যেন অন্তর্ভুক্ত হন। এক্ষেত্রে সরকারি পর্যায়ে জাতীয় কার্যক্রমের বাস্তবায়ন চলছে শ্রম মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কমিটির পর্যবেক্ষণে। বেসরকারি পর্যায়ে অ্যাকশন প্ল্যান নেওয়া হয়েছে। আইএলও তার নিজস্ব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এসব উদ্যোগের কাছে প্রত্যাশা অনতিবিলম্বে জরুরি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করুন। শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার প্রয়োজনের বিষয়ে এবং চিকিৎসার বিষয়ে দীর্ঘসূত্রতায় যেন

তাদের পরিবার এবং সন্তানদের জীবনের বর্তমানের অনিশ্চয়তা প্রলম্বিত না হয় সেদিকে সকলের লক্ষ রাখা দরকার।

প্রথম আলো
২৬ *জানুয়ারি* ২০১৪

রানা প্লাজা-পরবর্তী উদ্যোগে সমন্বয়হীনতা রয়েছে

মোস্তাফিজুর রহমান

রানা প্লাজার মতো এত ভয়াবহ শিল্প দুর্ঘটনা বিশ্বের আর কোথাও ঘটেনি। গত বছরের ২৪ এপ্রিল এই দুর্ঘটনার পর সারা বিশ্বে যেমন আলোড়ন তুলেছিল, ঠিক তেমনি দুর্ঘটনার এক বছর পূর্তিতে আবার আলোচনায় উঠে এসেছে। বৃহস্পতিবার রানা প্লাজা দুর্ঘটনার এক বছর পূর্তি হচ্ছে। কিন্তু এই এক বছরে ক্ষতিগ্রস্তরা কতটা ক্ষতিপূরণ পেলো, আর শিল্প মালিকরাই-বা কতটা সচেতন হলো তার হিসাব-নিকাশের সময় এসেছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা ও এর পরবর্তী এক বছর সার্বিক বিষয় পর্যবেক্ষণ করেছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান সকালের খবরকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেছেন, রানা প্লাজা-পরবর্তী ঘটনায় যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাতে সমন্বয়হীনতা রয়েছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা নিয়ে তিনি আরও অনেক কথা বলেছেন।

সকালের খবর: রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর এক বছর হতে যাচ্ছে। এই এক বছরে হতাহত শ্রমিকদের বা তাদের পরিবারের সদস্যদের যে সহায়তা দেওয়া হয়েছে তা কি যথেষ্ট বলে আপনি মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: রানা প্লাজার ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি একদিক থেকে খুবই প্রয়োজনীয়, আবার অন্য দিক থেকে খুব জটিলও। প্রথমে যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদেরকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন; আবার যারা ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের মধ্যেও রয়েছে মাত্রার ভিন্নতা। কেউ মৃত্যুবরণ করছেন, কেউ পঙ্গু হয়ে গেছেন, কেউ পঙ্গু হয়ে সুস্থও

হয়েছেন কিন্তু কাজ পাচ্ছেন না। সুতরাং বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রশ্ন চলে আসছে। শুরুতে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল – প্রধানমন্ত্রী একটি ফান্ড করেছিলেন, ক্রেতারাও বিভিন্ন উদ্যোগের কথা বলেছেন; অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এগিয়ে এসেছেন। তবে এসব উদ্যোগ ত্বরান্বিত করতে আরও সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল। হাইকোর্ট যে রুল দিয়েছিলেন তার ভিত্তিতে একটি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ঠিক করা হয়েছে। বিজিএমইএ-ও প্রথম দিকে একটা অঙ্কের কথা বলেছিল। এসব দিক বিবেচনা করে বললে বলতে হয়, সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতির তারতম্যের বিচারে ক্ষতিপূরণের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এক বছর পার হয়ে গেছে তবুও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তা খুবই হতাশাজনক। অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছেন, অনেক ছেলেমেয়ে এতিম হয়ে গেছেন, সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটিকে হারিয়েছেন অনেকে, অনেকেই আবার পঙ্গু হয়ে গেছেন। এসব পরিবার গত এক বছর ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বিভিন্ন সময় তাদের যে সহায়তা দেওয়া হয়েছে তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় এবং আশু ও দীর্ঘকালীন চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। রানা প্লাজার ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়ে যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বা আমাদের অ্যাকশন প্ল্যানে যেভাবে বলা হয়েছে সেগুলোর জন্য সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেগুলো ইতিবাচক। কিন্তু এসব উদ্যোগ, আরও দ্রততার সঙ্গে, সমন্বিতভাবে এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ক্ষতিপূরণ প্রদানের সম্ভাব্য সব সূত্রকে একত্রিত করে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি সুনির্দিষ্ট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু এক বছর পূর্ণ হচ্ছে, সে কারণে আমরা আশা করবো, ক্ষতিপূরণের প্রসঙ্গটির যেন গ্রহণযোগ্য সমাধানের মাধ্যমে ইতি টানা হয়।

সকালের খবরঃ অনেকেই পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন এ দুর্ঘটনায়। তাদের এবং যারা সুস্থ ছিলেন তাদের সহায়তার বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখেন?

মোস্তাফিজুর রহমানঃ যারা পঙ্গু হয়েছেন তাদের চিকিৎসাটা অনেক ক্ষেত্রেই মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি। সে ক্ষেত্রে তাদের যাতে স্থায়ী একটি আয়ের ব্যবস্থা করা যায় সে দিকটি দেখতে হবে। বিভিন্ন সংগঠন থেকে তাদেরকে সহায়তার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের প্রাথমিকভাবে যে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন সেটা হয়তো সাধ্যমতো মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তাদের পরিবারের একটা সুনির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা করাটা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। যারা কর্মসংস্থানের সুযোগ হারিয়েছিলেন তাদের কোনো একটি কাজ দেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে – এটা ভালো উদ্যোগ। কিন্তু তারা

আবার যেন আগের মতো আয় করতে পারেন, সেদিকে লক্ষ রাখাও জরুরি। সে ক্ষেত্রে তাদেরকে সামাজিক সহযোগিতার সাথে সাথে পরবর্তীতে অব্যাহত সহযোগিতা দেওয়ার প্রয়োজন হবে।

সকালের খবর: এ ঘটনার পর থেকে গার্মেন্ট মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলো কি যথেষ্ট মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: গার্মেন্ট মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। যেসব কর্মসূচি ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে বিজিএমইএ-ও যুক্ত আছে; তারাও বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু আমরা আশা করবো ক্ষতিপূরণ, কর্মসংস্থান, শ্রমিকদের জন্য উন্নততর কর্মপরিবেশ, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন রাইটস – এসব বিষয়ে বিজিএমইএ যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বিজিএমইএ-র পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট, সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা থাকবে। অ্যাকশন প্ল্যানসমূহে বিজিএমইএ-র সদস্যদের যে দায়িত্বের কথা বলা আছে আমরা আশা করবো তারা সেগুলো আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করবেন। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর শুরুতে যেভাবে দুর্গতদের সাহায্যার্থে, তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার্থে, এতিম শিশুদের সহযোগিতা করার জন্য যে ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আগ্রহ নিয়ে সবাই এগিয়ে এসেছেন তা নিশ্চয়ই উল্লেখ করার মত। তার ফলশ্রুতিতে বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছিল। কিন্তু হতাহতদের জন্য যখন দীর্ঘমেয়াদি সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ল তখন দেখা গেল সেই সাহায্য-সহযোগিতাটা অপ্রতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজিএমইএ-র উদ্যোগেও দেখা গেল সমন্বয়হীনতা। প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এক লাখ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও বিভিন্ন মাধ্যম থেকে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়েছে। বিজিএমইএ-র তরফ থেকে বকেয়া মজুরি মেটানো হয়েছিল। এগুলো দিয়ে শ্রমিকদের প্রাথমিক পর্যায়ের যেসব প্রয়োজন ছিল সেগুলো পূরণ করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু রানা প্লাজা যে ধরনের দুর্ঘটনা এবং এই দুর্ঘটনার কারণে শ্রমিকদের ওপর এর যে বহুমুখী প্রতিক্রিয়া ও অভিঘাত সেটি আসলে এক মাস, দুই মাস, ছয় মাস বা এক বছরের সাহায্য-সহযোগিতার বিষয় নয় – দীর্ঘমেয়াদি সাহায্য দরকার। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো সারা জীবনের জন্যও সাহায্য প্রয়োজন। সে প্রেক্ষাপটে যে ধরনের উদ্যোগ, পরিকল্পনা বা সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল সে জায়গাগুলোতে কিন্তু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায়নি।

সকালের খবর: বিদেশি ক্রেতারা বছরে ২৩ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক বাংলাদেশ থেকে কিনে কোটি কোটি ডলার মুনাফা করছে। রানা প্লাজা নিয়ে তাদের ভূমিকা কেমন হওয়া দরকার ছিল?

মোস্তাফিজুর রহমান: রানা প্লাজা-পরবর্তী পদক্ষেপসমূহের প্রেক্ষাপটে আমাদের তৈরি পোশাকের যারা বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক দিক হলো – বড় বড় ব্র্যান্ড ও মূল মূল ক্রেতা প্রতিষ্ঠান যারা আছে তারা বাংলাদেশকে বয়কট করে নয় বরং বাংলাদেশের সঙ্গে একত্রে কাজ করে সমস্যা সমাধানের মনোভাব দেখিয়েছেন। এটা খুবই ইতিবাচক দিক বলে আমি মনে করি এবং সে কারণেই তারা যাতে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক ক্রয় করেন, বাংলাদেশের প্রতি তাদের আগ্রহটা যাতে অব্যাহত থাকে সে জন্য তাদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ থেকে তাদের উদ্যোগসমূহে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া খুবই প্রয়োজন। তারা তাদের পক্ষ থেকে যেসব কর্মসূচি নিয়েছেন সেগুলোর মধ্যেও একটা সমন্বয় দরকার। বিশেষত আমরা দেখছি, অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্স যেসব প্রোগ্রাম নিচ্ছে তন্মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন। সমন্বয় করা হলে, উদ্যোক্তরা জানবেন যে একটা অভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে যেটা তাদেরকে মেনে নিতে হবে, যা বাস্তবায়ন করতে হবে।

এছাড়া অনেক ছোট ছোট গার্মেন্ট প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের পক্ষে রি-লোকেশন করা, কারখানাগুলোতে খুব বড় ধরনের পরিবর্তন আনা – এসব বেশ কষ্টসাধ্য, সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়সাধ্যও বটে। সেদিক থেকে মেজর ব্র্যান্ডগুলো যদি এ ধরনের কারখানাগুলোকে সহায়তা করতে পারে তাহলে সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব। প্রথমত, এই পুনর্গঠনের জন্য উদ্যোক্তাদের যুক্তিসঙ্গত সময় দেওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত, এই পুনর্গঠনের কাজে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থিক সহায়তা দিতে পারে যার জন্য একটা ফান্ড প্রতিষ্ঠা করে সে ফান্ড থেকে স্বল্প সুদে বা বিনা সুদে উদ্যোক্তাদের ঋণ দেওয়া যেতে পারে। সরকারের পক্ষ থেকেও সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে, প্রণোদনা দিতে হবে। এ ধরনের বহুমুখী সহায়তা অনেক ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের এই প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলে নিতে সহায়ক হবে।

সকালের খবর: রানা প্লাজা-পরবর্তী গার্মেন্ট কারখানা সংস্কারসহ যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেগুলো পোশাকশিল্পের জন্য কতটা মঙ্গলজনক হবে বলে আপনি মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: যেসব পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে এ শিল্পের জন্য তা মধ্য-দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক হবে। আমার মনে হয়, প্রত্যেকটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটা সুযোগও থাকে। বিশ্ববাজারে আমরা যদি 'বাংলাদেশ ব্র্যান্ড'-কে একটা ভালো ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তাহলে বাজারজাতকরণ ও ভালো মূল্য পাবার ক্ষেত্রে এর একটা সুফলও আসবে। বিদেশিরা জানবে, এদেশে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, এখানের কর্মপরিবেশ ভালো, এখানে শ্রমিকদের জীবন

ধারণের উপযোগী মজুরি দেওয়া হয়। এগুলো যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলে এ খাতের উত্তরোত্তর বিকাশের ক্ষেত্রে পদক্ষেপগুলো ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এজন্য আমাদের উচিত হবে এখন আমরা যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করছি, এর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে তাকে কেবল ব্যয় না ভেবে ভবিষ্যতের জন্য যেন বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হয়।

সকালের খবর: এত সংকট সত্ত্বেও বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্পের সামনে আপনি সম্ভাবনা কেমন দেখছেন।

মোস্তাফিজুর রহমান: তৈরি পোশাক খাতের বিশ্ববাজার সাড়ে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। তার মাত্র ২২ বিলিয়ন ডলার বা পাঁচ শতাংশ আমরা রপ্তানি করছি। এ ক্ষেত্রে চীনের অংশ শতকরা ৩০ ভাগ। কিন্তু চীনের প্রাধান্য ক্রমান্বয়ে কমে আসছে, হ্রাস পাবে। এর প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পক্ষে যদি বিশ্ববাজারে একটা কমপ্লায়েন্ট দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় তবে আমার মনে হয় আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশের এই পাঁচ শতাংশকে সাত-আট শতাংশে নিয়ে যাওয়া এবং আমাদের ২২-২৩ বিলিয়ন ডলারের বর্তমান রপ্তানি ৪০-৪৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব।

সকালের খবর
২২ এপ্রিল ২০১৪

সাক্ষাৎকার: এসএম আলমগীর

ব্যর্থতা আসলে সব পক্ষের

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

সাভারের রানা প্লাজা ধসের পর দেড় বছর পার হয়েছে। এখনো হতাহত ব্যক্তিরা পুরো ক্ষতিপূরণ পাননি। কারখানা পরিদর্শনের কাজ চলছে। এসব বিষয় নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) গবেষক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

প্রথম আলো: রানা প্লাজা ধসের পর পোশাকশিল্পে শ্রমিকদের নিরাপত্তায় কোনো পরিবর্তন কি এসেছে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: ভবন ধসের পর পোশাকশিল্পের কর্মপরিবেশ উন্নত করার কাজটি দেশি ও বিদেশি চাপের মুখে শুরু হয়। তবে পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তা ও সরকার এটির গুরুত্ব অনুধাবন করে সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনার অধীনে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশের ক্ষেত্রে কারখানা পর্যায়ের সমস্যাগুলো চিহ্নিত হয়েছে। অ্যাকর্ডের পরিদর্শনে ৮০ হাজার ত্রুটি খুঁজে পাওয়া গেছে, যার অধিকাংশই অগ্নি ও বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত ত্রুটি। আবার ২ শতাংশ কারখানা ভবনের কাঠামোতে দুর্বলতা রয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ যথেষ্ট ঝুঁকির মধ্যে আছে। তাই সংস্কারকাজগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করতে হবে। অন্যথায় চাপের মুখে অর্জিত সীমিত অগ্রগতি দিয়ে শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। অন্যদিকে প্রাথমিক অগ্রগতি নিয়ে এখনই সন্তুষ্টি প্রকাশের সুযোগ নেই। বরং উল্টোটা করলে সঠিকভাবে সংস্কারকাজ শেষ করার ক্ষেত্রে ভুল বার্তাও দিতে পারে।

প্রথম আলো: ক্ষতিপূরণের বিষয়টি এখনো প্রাথমিক পর্যায়েই ঝুলে আছে। এ ক্ষেত্রে মালিক ও ক্রেতাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা দেখা যায়নি। কেন এমনটা হলো?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় নিহতের পরিবার ও আহত শ্রমিকদের প্রাথমিক অনুদান বা সাহায্য বাবদ এককালীন অর্থ প্রদান করা হয়েছে। তবে দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সামান্য। দেশীয় আইনে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি এখনো অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে সরকার, বিজিএমইএ, মালিক ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন না করাকেই দায়ী করা যায়। বিশেষ করে ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে বিজিএমইএ-র দায়সারা ভাব চোখে পড়ার মতো। তবে সুস্পষ্ট কাঠামোর আলোকে বিদেশিদের উদ্যোগে ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের বিষয়টি প্রশংসনীয়। ক্রেতাদের সহযোগিতার অভাবে সেটির আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে। হাইকোর্টের উদ্যোগে ক্ষতিপূরণের একটি উদ্যোগও মাঝপথে থেমে গেছে। অন্যদিকে সরকারের কাছে থাকা প্রায় ১০৫ কোটি টাকা শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। আসলে বাস্তবায়নের এই ব্যর্থতা সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের। সবার দায় এড়ানোর প্রবণতা ও সুস্পষ্ট আইনের অভাব যুক্ত হওয়ায় বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম আলো: ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনা এড়াতে সরকার কিংবা বিজিএমইএ কিংবা মালিকপক্ষ রানা প্লাজা ধস থেকে শিক্ষা নিয়েছেন বলে কি আপনার মনে হয়?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: পোশাকশিল্পের উন্নয়নে সরকার, মালিক ও আইএলও গঠিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ওপরই নির্ভর করছে রানা প্লাজা ধস থেকে সংশ্লিষ্টরা কতটুকু শিক্ষা নিয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোনো ধরনের অবহেলা, দীর্ঘসূত্রতা বা অজুহাত তোলা শিক্ষা গ্রহণের অনিচ্ছাকেই প্রকাশ করবে। মোট কথা, রানা প্লাজা দুর্ঘটনা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উদ্যোগ যদি চাপের মুখে বাস্তবায়ন হয় এবং বাস্তবায়নে সদিচ্ছার অভাবে থাকে তবে শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। কয়েক মাস ধরে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে যে প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, তাতে নিশ্চিত করে বলা যায়, ক্রেতারা বাংলাদেশের কর্মপরিবেশ নিয়ে এখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছেন। সুতরাং এ সংস্কারকাজ সঠিকভাবে শেষ না হলে ক্রেতাদের মনোভাব পরিবর্তন হবে না। এতে দীর্ঘমেয়াদি রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বাড়তে পারে।

প্রথম আলো
২৫ অক্টোবর ২০১৪

সাক্ষাৎকার: শুভংকর কর্মকার

রানা প্লাজা ধস ও পোশাকশিল্পের ভবিষ্যৎ

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

রানা প্লাজা ধস বিশ্বের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের উৎপাদন-শৃঙ্খলের জন্য এক অচিন্তনীয় ঘটনা, শ্রমিকের নিরাপত্তাহীন কর্মপরিবেশের অনন্য উদাহরণ। এ দুর্ঘটনা উৎপাদন-শৃঙ্খলের সুশাসনগত দুর্বলতার বড় নজির। সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী উৎপাদন-শৃঙ্খলের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে শ্রমিকের অধিকারসংক্রান্ত সামাজিক কমপ্লায়েন্সের উন্নয়ন না হওয়া ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছিল। সে সময় রানা প্লাজার দুর্ঘটনা কার্যকর সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পোশাকশিল্পের আন্তর্জাতিক উৎপাদন-শৃঙখল পুনর্গঠনের বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে।

রানা প্লাজা ধসের পর উৎপাদন-শৃঙ্খলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা নিজেদের অবস্থানগত দুর্বলতা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় জড়িত হয়েছে দেশি উদ্যোক্তা, সরকার, আমদানিকারক, উন্নয়ন অংশীদার ও আন্তর্জাতিক সংস্থা। গৃহীত ব্যবস্থাদির উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশকেন্দ্রিক। এসব উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বাংলাদেশে কারখানা পর্যায়ে শ্রমিকের কর্মনিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নত করা, উন্নত শিল্প সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং শ্রমিকের জীবনমান উন্নত করা। বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাক খাতে যে নানামুখী সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কাজ চলছে, তা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে স্বাক্ষরিত 'কমপ্যাক্ট' চুক্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি পুনরুদ্ধারের শর্ত হিসেবে প্রদত্ত কর্মকৌশল, ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের কারখানা সংস্কার ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বিভিন্ন উদ্যোগের অংশবিশেষ। একই সময়ে পোশাক খাত বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। পোশাক খাতের ভবিষ্যৎ নিয়ে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। এসব প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন।

ক. চলমান সংস্কার কি পোশাক খাতের সক্ষমতা বাড়াবে? এক কথায় বললে, এটা বাংলাদেশে পোশাক খাতের শ্রমিক-সম্পর্কিত কাঠামোগত ও সামাজিক কমপ্লায়েন্সের সক্ষমতা বাড়াবে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার আগে সামাজিক কমপ্লায়েন্সে কম সংবেদনশীল পণ্য যেমন, স্বল্পমূল্যের নিট ও ওভেন পণ্যে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা নিজেদের দক্ষতা ও সক্ষমতা ধরে রেখেছিল। এমনকি তা বেড়ে কমপ্লায়েন্স-সংবেদনশীল মধ্যম মানের পণ্যে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছিল। রানা প্লাজা ধস এ অগ্রগমন প্রক্রিয়াকে শ্লথ করে দেয়। বর্তমানে গৃহীত সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে সে সক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সুযোগ রয়েছে।

বেশ কিছু ক্ষেত্রে সরকারের অগ্রগতি লক্ষণীয়। শ্রম আইন ২০০৬ সংস্কার করে সংশোধিত শ্রম আইন ২০১৩ জারি করা হয়েছে। অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের অধীনে কারখানা পর্যায়ে অগ্নি, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা চিহ্নিত করার কাজ চলছে। কারখানার প্রাথমিক তথ্যভাণ্ডার তৈরির কাজ চলছে এবং কারখানা পর্যায়ে নতুন নতুন শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধিত হচ্ছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে আংশিক অর্থ সহায়তা এবং আহত শ্রমিকদের একাংশকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নতুন কারখানা পরিদর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং আরও নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। মাত্র দেড় বছরে এ কাজ সম্পন্ন হওয়া আপাতভাবে বড় অগ্রগতি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ তিন দশক ধরে অব্যাহত অবহেলার কারণে পুঞ্জীভূত জরুরি অনিষ্পন্ন কাজের দীর্ঘ তালিকা বিবেচনা করলে এই অগ্রগতি যথেষ্ট নয় বলেই প্রতীয়মান হয়।

তবু সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন রকমের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। অনেকে বলছেন, মাত্র ২ শতাংশ কারখানা ক্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মনে রাখা দরকার, এই ২ শতাংশ শুধু কাঠামোগত ক্রুটিপূর্ণ ভবনের সংখ্যা। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের কর্মপরিবেশের নিরাপত্তার জন্য অধিকতর দায়ী অগ্নি ও বৈদ্যুতিক ক্রুটিযুক্ত কারখানা ৯০ শতাংশের ওপরে। নতুন শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধনের পাশাপাশি কিছু কারখানায় শ্রমিক নেতাদের সংগঠন গড়ার চেষ্টার জন্য নিগৃহীত হতে হচ্ছে। অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সভুক্ত কারখানা পরিদর্শনের কাজ এগোলেও অনেক ছোট বা সাব-কন্ট্রাক্টিং কারখানার পরিদর্শনের কাজ এগোচ্ছে ধীরগতিতে। চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে কারখানা পর্যায়ে উদ্যোগে ধীরগতি রয়েছে। তবে এসব সংস্কার সুচারুভাবে সম্পন্ন করা গেলে পোশাক খাতের 'কমপ্লায়েন্স' আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হবে, যা বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ইমেজ পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে। সুতরাং স্বল্পমেয়াদে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকলেও মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে এ সংস্কারকাজ বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়িয়ে নতুন পর্যায়ে উন্নীত করবে।

খ. গৃহীত সংস্কার কতটা ব্যয়বহুল? কারখানা পর্যায়ে চিহ্নিত সমস্যাগুলোর অধিকাংশই অগ্নি ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনাগত ক্রটি, যা শুধু ব্যবস্থাপনাগত সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব। তবে অগ্নি দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে কারখানাগুলোকে অগ্নিপ্রতিরোধক 'ফায়ার ডোর' স্থাপন এবং দুর্ঘটনাকালে পানি ছিটানোর জন্য 'স্প্রিঙ্কলার' ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে, যা ব্যয়সাপেক্ষ। আশার কথা, এ বাড়তি ব্যয় মেটাতে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাপানি সংস্থা (জাইকা), আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ করপোরেশন (আইএফসি) ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো। চলতি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে কারখানা পর্যায়ে অগ্নিনির্বাপণে প্রয়োজনীয় পণ্যের কাঁচামাল বিনা শুল্কে আমদানির সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বাড়তি ব্যয় মেটাতে সরকার উদ্যোক্তাদের কর হার উৎপাদিত রপ্তানি মূল্যের ০.৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.৩ শতাংশ করেছে। রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের ঋণসুবিধা বাড়ানো হয়েছে। অপ্রচলিত বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে অর্থ সুবিধা ২ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশে বাড়ানো হয়েছে। এসব ব্যবস্থা উৎপাদন ব্যয়ের বাড়তি চাপ অনেকাংশে কমাতে সহায়তা করছে।

তবে দুশ্চিন্তার বিষয়, ছোট ও সাব-কন্ট্রাক্টিংয়ে নিয়োজিত কারখানাগুলো বাড়তি ব্যয় মিটিয়ে সক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কিনা। বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, সাব-কন্ট্রাক্টিংয়ে নিয়োজিত কারখানাগুলোর নিজস্ব ভবন না থাকলে তারা সেগুলো থেকে পণ্য কেনা কমিয়ে দেবে। কারণ, এসব কারখানায় পর্যাপ্ত অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আবার সরাসরি রপ্তানিকারক নয় বলে এসব কারখানা ওপরে বর্ণিত অনেকগুলো সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে এসব কারখানার জন্য বাড়তি ব্যয়ের চাপ মিটিয়ে ন্যূনতম মুনাফা ধরে রাখা কষ্টকর হতে পারে। তবে বিজিএমইএ-র বরাত দিয়ে রানা প্লাজা ধসের পর ২০০-এর বেশি কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার যে তথ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তা ভ্রমাত্মক। এসব কারখানার অধিকাংশই রানা প্লাজা ধসের বহু আগে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতায় বন্ধ হয়েছে। তবে সাব-কন্ট্রাক্টিং কারখানায় সংস্কারকাজ সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা প্রয়োজন হতে পারে।

বাংলাদেশের পোশাক খাতকে ভবিষ্যতে 'উচ্চ কমপ্লায়েন্স-উচ্চ মজুরি' এবং 'উচ্চ ব্যয়-উচ্চ আয়' কাঠামোতে পরিচালিত হতে হবে। বাড়তি ব্যয় মেটাতে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কারখানার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যকাঠামো পরিবর্তন করে উচ্চ ও মধ্যম মানের পণ্য উৎপাদন বাড়ানো বিশেষ প্রয়োজন। উৎপাদন চেইনের সব পর্যায়ে বাড়তি ব্যয় সমন্বয়ের প্রস্তুতি থাকলে ক্ষুদ্র-মাঝারি কারখানা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকার কথা নয়।

গ. কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম কি পোশাক খাতকে অস্থিতিশীল করতে পারে? সংশোধিত শ্রম আইন ২০১৩-এ কারখানা পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন করা সহজতর করা হয়েছে। ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ২২৮টি নতুন ট্রেড ইউনিয়ন হয়েছে। এ ছাড়া আরও ৭০টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এখন পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ইতিবাচকভাবে এগোচ্ছে। শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধে ইউনিয়নগুলো ধীরে হলেও কাজ করছে। কার্যকর ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। একইভাবে উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক এবং সুপারভাইজার পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন-সম্পর্কিত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। উন্নততর শিল্প-সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া পোশাক খাতে স্থিতিশীলতা ধরে রাখা কষ্টকর। আশা করা যায়, কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম জাতীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থাকবে। নতুবা কারখানায় উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে এবং শ্রমিক হয়রানি বন্ধে আলাদা শিল্প-সম্পর্ক আইন প্রয়োজন হতে পারে।

ঘ. বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা ভবিষ্যতে বহাল থাকবে কি? বিগত দশকগুলোতে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, ভারত, চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়াসহ বিভিন্ন বাজারে শুল্কমুক্ত বাজারসুবিধা আছে। রানা প্লাজা ধসের পর যুক্তরাষ্ট্র শুল্কমুক্ত সুবিধা স্থগিত করেছে। তবে তৈরি পোশাক এ সুবিধার আওতা-বহির্ভূত ছিল।

আগামী দিনে প্রধান বাজারগুলোতে বাজারসুবিধা অব্যাহত রাখা বা সুবিধা পুনর্বহালের বিষয় অনেকাংশে নির্ভর করছে বর্তমান সংস্কার কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ওপর। যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া ১৬টি বিষয়সংবলিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন মধ্যবর্তী পর্যায়ে রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কমপ্যাক্টের বাস্তবায়ন কিছুটা ধীরে এগোচ্ছে। শুরুর দিকের তুলনায় বাস্তবায়নের এখন গতি বেশ মন্থর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডও দেখা যাচ্ছে। আবার বাস্তবায়ন কার্যক্রমের মধ্যম পর্যায়ে এসেই বাজারসুবিধা পুনর্বহাল না হওয়াকে রাজনৈতিকভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এসব ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর শ্রম অধিকারসংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু চলমান সংস্কারকাজগুলো থেকে পিছিয়ে আসার সুযোগ নেই।

ঙ. দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিবেশ উন্নয়ন হবে কি? আশা করা যায়, বর্তমান সংস্কার কার্যক্রম বাংলাদেশের পোশাক খাতকে কাঠামোগত ও সামাজিক কমপ্লায়েন্সে 'এককালীন' সক্ষমতা দেবে। কিন্তু তা অব্যাহত রাখতে সব ধরনের ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও

ব্যবস্থা গ্রহণ-সম্পর্কিত সক্ষমতা বাড়ানো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ-র সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রয়োজন। এসব সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা আরও প্রশাসনিক কাঠামোতে পরিচালিত হওয়া দরকার, যেখানে প্রেসিডেন্ট বা পরিচালকদের ভূমিকা হবে নীতিনির্দেশনামূলক। কারখানা পর্যায়ে করপোরেট কাঠামো গড়ে তোলা দরকার। শ্রম সংগঠন, শ্রম অধিকার ও উদ্যোক্তা-শ্রমিক পক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতার জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সবশেষে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রধানদের নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখা এ খাতের সব অংশীজনের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম আলো
৬ নভেম্বর ২০১৪

অধ্যায় ৫

বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা

বাংলাদেশে বিদেশি সাহায্যের ভূমিকা

ফাহমিদা খাতুন

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশি সাহায্যের ভূমিকা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। বলা হয়, বিদেশি সাহায্য সেসব দেশেই কার্যকর যেখানে ভালো আর্থিক, মুদ্রা ও বাণিজ্য নীতিমালা রয়েছে। অন্যপক্ষের বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, বিদেশি সাহায্য কার্যকর হওয়ার সাথে গ্রহীতা দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালার কোনো সম্পর্ক নেই। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, দরিদ্র দেশগুলোর প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতিমালা প্রণয়নের সক্ষমতা কম থাকার কারণে তারা বিদেশি সাহায্যের দাতাদের সাথে আলাপ-আলোচনা, এর ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুর্বল থাকে। কিন্তু সাহায্যের কার্যকারিতার সাথে গ্রহীতা দেশের নীতিমালার দক্ষতাকে সম্পর্কিত করলে সাহায্যব্যবস্থার অন্যান্য দুর্বলতাগুলো ঢাকা পড়ে যায় এবং সব ব্যর্থতার দায় গিয়ে পড়ে সাহায্যগ্রহীতা দেশের ওপর। যার ফলে সাহায্য বরাদ্দের ক্ষেত্রে দাতাদের অগ্রাধিকার, সাহায্যপ্রবাহ এবং গ্রহীতা দেশের প্রয়োজনের মধ্যে ফারাক, সাহায্যপ্রবাহে অনিশ্চয়তা, দাতা ও গ্রহীতার একই পর্যায়ের জবাবদিহি না থাকা, বিশ্ব সাহায্যব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলো দৃষ্টির আড়ালে রয়ে যায়।

সাহায্যগ্রহণকারী দেশের নীতিমালার কারণে নয়, বরং দাতারা যেভাবে সাহায্যের প্রয়োজন নির্ধারণ করে ও অর্থ ছাড় করে মূলত সেই প্রক্রিয়াই অকার্যকর সাহায্যের জন্য দায়ী। এটি ২০০৫ সালে প্যারিস ঘোষণায় প্রথমবারের মতো স্বীকার করা হয়েছে। তবে এর আগেও বিভিন্ন ফোরামে বিদেশি সাহায্যের কার্যকারিতা বাড়ানোর ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা শুরু হয়। ২০০২ সালে মেক্সিকোর মনটেরেতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের 'উন্নয়ন অর্থায়ন' শীর্ষক সম্মেলনে যে ঐকমত্য হয়েছিল তাতে বিদেশি সাহায্য বাড়ানোর পাশাপাশি এর কার্যকারিতাও জোরদার করার প্রচেষ্টা চালানোর সুপারিশ করা হয়। এ ব্যাপারে আরও মনোযোগ দেওয়ার কথা বলা হয় ২০০৩ সালে ইটালির রোমে অনুষ্ঠিত

উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে। এরপরে ২০০৫ সালে প্যারিস ঘোষণাতে বিদেশি সাহায্যের কার্যকারিতা জোরদার করার ওপর আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্যারিস ঘোষণা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি প্রতিশ্রুতি, যেটি বিদেশি সাহায্যের ক্ষেত্রে সংস্কারবিষয়ক মূলনীতি হিসেবে বিবেচিত হয়। ওই ঘোষণায় বিশ্বের একশ জনেরও বেশি মন্ত্রী, বিভিন্ন সংস্থার প্রধান ও সংশ্লিষ্ট অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সই করেন। প্যারিস ঘোষণায় সাহায্যদাতা ও গ্রহীতা উভয়পক্ষই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যাতে বিদেশি সাহায্যের বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন সুষ্ঠু, বর্ধিত ও অধিকতর ফলপ্রসূ হয় এবং তা নির্ণয়ে তদারকির ব্যবস্থাও থাকে। বিদেশি সাহায্যের কার্যকারিতা সংক্রান্ত এই ঘোষণার মূল্যায়ন ও অগ্রগতি সাধনে পরবর্তীতে আরও কয়েকটি মাইলফলক অর্জিত হয় ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে ঘানার আক্রায় এবং ২০১১ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে। এই দুটি বৈঠকে বিদেশি সাহায্য দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে প্যারিস ঘোষণার আলোকে বৃহত্তর ঐকমত্যের ওপর জোর দেওয়া হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন বিদেশি সাহায্য কার্যকরী হয় না? এর পেছনে প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে সাহায্য প্রদান ও ব্যবহার। উভয় ক্ষেত্রেই সক্ষমতার অভাব এবং চিরায়ত দাতা-গ্রহীতা সম্পর্ক বিদ্যমান। গতানুগতিকভাবেই দাতা-গ্রহীতা সম্পর্ক অসম হয়, যেখানে একপক্ষ শক্তিশালী ও অন্যপক্ষ বেশ দুর্বল থাকে। এক্ষেত্রে দাতা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও স্বার্থই বেশি জোরালো থাকে। যে কারণে সাহায্যগ্রহীতা দেশের সামনে পছন্দের স্বাধীনতা খুবই কম থাকে। উপরন্তু বিভিন্ন সময়ে বিদেশি সাহায্যব্যবস্থায় নানা ধরনের সংস্কার হচ্ছে। কিন্তু ওইসব সংস্কারে সাহায্যগ্রহণকারী দেশের মতামত খুব কমই প্রতিফলিত হয়েছে। যে কারণে গ্রহীতা দেশে বিদেশি সাহায্যের কার্যকারিতাও জোরদার হতে পারছে না। সাহায্যব্যবস্থায় দাতাদের দিক থেকে সাহায্যগ্রহণকারী দেশগুলোর সম্পৃক্ততাকে তেমন একটা উৎসাহিত না করাটাও এজন্য আংশিকভাবে দায়ী। তবে এটিও সত্য যে, আন্তর্জাতিক সাহায্যব্যবস্থায় গ্রহীতা দেশগুলো অংশগ্রহণের সুযোগ পেলেও নিজেদের মতামত তেমনভাবে তুলে ধরতে পারছে না। সাহায্যের কার্যকর ব্যবহারের প্রশ্নে তাদের সক্ষমতার অভাব রয়েছে। তবে শুধু গ্রহীতাদেরই নয়, দাতাদের মধ্যেও প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রে সক্ষমতার দুর্বলতা আছে। দাতারা কোনো দেশকে সাহায্য দেওয়ার সময়ে সেখানকার স্থানীয় ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করে না। যে কারণে দাতাদের সদর দপ্তরের নীতিমালার সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতায় অনেক তফাৎ থেকে যায়।

বাংলাদেশে বিদেশি সাহায্যপ্রবাহের ধারা ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তনটা শুধু সাহায্যের উৎস ও পরিমাণেই ঘটছে না, খাতভিত্তিক বরাদ্দ এবং ব্যবহারের দিক থেকেও

তা হচ্ছে। বিগত প্রায় দুই যুগে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতির সম্পৃক্ততা জোরদার হয়েছে। আমদানি, রপ্তানি, বিদেশি বিনিয়োগ ও প্রবাসী আয়ের বর্ধিত অংশ সেটিই ইঙ্গিত করে। যার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিদেশি সাহায্যের আনুপাতিক অংশ অনেক কমে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮১ সালে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বিদেশি সাহায্যের অংশ ছিল শতকরা ৫.৮ ভাগ, ২০১৩ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২.২ শতাংশে। বিদেশি সাহায্যের অংশ অর্থনীতিতে কমে আসলেও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে এর অংশ দেশীয় উৎস থেকে অর্থায়নের প্রায় সমান। মোট সাহায্যের সিংহভাগই আসে প্রকল্প সাহায্য বাবদ। বাংলাদেশে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন এবং সামাজিক খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিদেশি সাহায্যের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

তবে বিদেশি সাহায্যের ভূমিকা ও কার্যকারিতা নিয়ে বাংলাদেশেও বিতর্ক এবং দ্বিধা রয়েছে। যার ফলে বিদেশি সাহায্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ও দারিদ্র্য বিমোচনে প্রকৃত অর্থে কতখানি ভূমিকা রাখছে তা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। কখনো কখনো সাহায্যদাতাদের উপস্থিতি অর্থনৈতিক নীতিমালার সাথে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও বিস্তৃত হয়। বাংলাদেশের সুশাসন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নে দাতাদের বক্তব্য এখন নিয়মিত ব্যাপার। একদিকে শর্তের বেড়াজাল, অন্যদিকে সাহায্যপ্রবাহ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার অভাব, দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি কারণে সাহায্যের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে সাহায্য বরাদ্দের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য ও উন্নয়ন প্রাথমিক মাপকাঠি নয়। বরং রাজনৈতিক, কৌশলগত এবং উন্নয়নের উদ্দেশ্য বিবেচনা করেই সাহায্য দেওয়া হয়। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অনেক সময় দাতাদের হস্তক্ষেপের প্রবণতা থাকে। বিশ্ব অর্থনীতিতে অর্থায়নের উৎস হিসেবে অন্যান্য খাত যেমন অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালন, রেমিট্যান্স, বিদেশি বিনিয়োগ ইত্যাদির তুলনায় বিদেশি সাহায্যের পরিমাণ ইতিমধ্যেই কমে এসেছে। অপরদিকে যুদ্ধ-সংঘাতে জর্জরিত দেশগুলোর আর্থিক চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে বিদেশি সাহায্যের প্রবাহ বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে সংকুচিত হয়ে আসবে। অন্যদিকে সাহায্য ব্যবহারের ওপর নজরদারি ও কর্তৃত্ব বাড়বে। এরকম পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে বিদেশি সাহায্যের বাইরে অন্যান্য আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ সঞ্চালন করার প্রয়াস জোরদার করতে হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৩ এপ্রিল ২০১৪

সুযোগকে সতর্কতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশে জাপানের উচ্চতর বিনিয়োগ প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবিদার। বেশ কয়েকটা দিক থেকে এটা গুরুত্বপূর্ণ। জাপানের নতুন অর্থনৈতিক কৌশল হলো, চীনের ওপরে নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা। এ জন্যই তারা এখন বঙ্গোপসাগর ঘিরে তাদের বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র সন্ধান করছে। বে অব বেঙ্গলে তাদের এই অর্থনৈতিক আগ্রহকে তারা বলছে 'বিগ বি'। বাংলাদেশও যাকে বলে ব্লু ইকোনমি বা সামুদ্রিক অর্থনীতি, বঙ্গোপসাগর ঘিরে দক্ষিণাঞ্চলে তেমন একটি গ্রোথ জোন সৃষ্টি করার চিন্তা করছে। অবকাঠামোকে নতুন স্তরে উন্নীত করার মাধ্যমে আরও বেশি বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টির চিন্তাভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে এই চাহিদা। উভয় দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ এখানে দুই দেশকে এক বিন্দুতে মেলানোর সুযোগ পেয়েছে। উভয় পক্ষের আগ্রহের মধ্যে সমন্বয়ের একটি পদক্ষেপ হিসেবেই তাই জাপানের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর ও তার প্রস্তাবকে দেখা যায়।

বাংলাদেশে আমরা নিজস্ব ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারি না অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে। এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে গেলে অবকাঠামোতেই প্রথমে বিনিয়োগ প্রয়োজন। এর জন্য আগামী ১০ বছরে আমাদের ১০০ বিলিয়ন ডলারের মতো বিনিয়োগ লাগবে শুধু অবকাঠামো উন্নয়নে। সেদিক থেকে চিন্তা করলে জাপান যেসব প্রকল্পে বিনিয়োগের কথা বলছে, তাতে বাংলাদেশের স্বার্থ ও আগ্রহের সঙ্গে তার মিল আছে। পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মধ্যে সড়ক ও রেল যোগাযোগব্যবস্থাকে আরও বিকশিত করা এবং মাতারবাড়িতে বন্দর স্থাপন করে এক হাজার ২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করার প্রস্তাব তাই বাংলাদেশের চাহিদার প্রেক্ষিতে একটি ভালো প্রস্তাব।

জাপান বিভিন্ন কারণে চীনের ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে চায়। জাপানের মোট আমদানির শতকরা ২১ ভাগ আসে চীন থেকে। জাপান প্রতি বছর চীনে সাত-আট বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ করে জাপানের বাজারকে লক্ষ্য করে। এ নির্ভরশীলতা হ্রাসে জাপানের যে আগ্রহ তারই একটি প্রতিফলন বে অব বেঙ্গল অঞ্চলের প্রতি তাদের আগ্রহ। জাপান বিনিয়োগের নতুন গন্তব্য খুঁজছে; বাংলাদেশকে এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। যে বিনিয়োগের কথা বলা হচ্ছে তাতে কর্মসংস্থান হবে, জ্বালানি সক্ষমতা বাড়বে এবং শিল্পায়ন হবে – যার সুফল, আশা করা যায়, সেদিক থেকেই বাংলাদেশ লাভ করতে সক্ষম হবে।

জাপান রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে প্রায় প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রে, এ বাজার সুবিধা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাপানি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ৫০টি কোম্পানির প্রতিনিধি ছিলেন। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে যে শূন্য শুল্ক সুবিধা বাংলাদেশ পায়, সে সুবিধা ব্যবহার করে বাংলাদেশে প্রস্তুত পণ্য জাপানে সরবরাহ করলে জাপানি কোম্পানির প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভারতে যে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা পায়, জাপানি বিনিয়োগকারীরা ভারতে রপ্তানি করার ক্ষেত্রে তার সুবিধাও গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

এটা সুবিদিত যে, বাংলাদেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। জাপানি ব্যবসায়ীরা বিজনেস ফোরামে যে কথা বলেছেন তাতে বোঝা যায়, বাংলাদেশের বৃদ্ধিশীল অভ্যন্তরীণ বাজারকেও তারা বিবেচনায় রেখেছে। সুতরাং, জাপানের বিনিয়োগ প্রস্তাবের লক্ষ্যের মধ্যে থাকছে জাপানি বাজার, ভারতের বাজার এবং বাংলাদেশের বাজার। দক্ষিণ এশিয়াঞ্চলে শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলায় জাপান ও বাংলাদেশের স্বার্থের মধ্যে একটা অভিন্নতা রয়েছে।

আমরা যে বিসিআইএম (Bangladesh-China-India-Myanmar) ইকোনমিক করিডরের কথা বলছি, সেটার সুবিধাও জাপান পাবে। এ করিডোর ব্যবহার করে কাঁচামাল ও পণ্য আমদানি করতে পারবে জাপানি বিনিয়োগকারীরা। জানা কথা চীন ও ভারতেরও আগ্রহ আছে বিসিআইএম-এ। করিডোর থেকে দক্ষিণমুখী সম্প্রসারণের সুবিধা পাবে বাংলাদেশ। ভৌগোলিক অবস্থানের অনন্যতার সুবাদে বাংলাদেশ ভারত-চীন-জাপান-এ ত্রিভুজের সুবিধা নিতে সক্ষম হবে। তবে এসব সুবিধা গ্রহণ করতে হলে বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে উদ্যোগী ভূমিকা রাখতে হবে।

বলা প্রয়োজন, জাপানের এই আগ্রহ বাংলাদেশের অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের থেকে তুলনামূলকভাবে উদার। অতীত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশকে

দেওয়া জাপানের ঋণগুলো হয় স্বল্প সুদের সফ্‌ট লোন; এ ক্ষেত্রে জাপান সাধারণত কঠিন শর্তাবলী আরোপ করে না। এর একটা উদাহরণ হলো তাদের দেওয়া 'ডেট ক্যানসেলেশন ফান্ড'। বাংলাদেশের কাছে প্রাপ্তব্য জাপানি ঋণ মওকুফ করে এ ফান্ড করা হয়েছে যা থেকে আমরা প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি।

২০০৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই তহবিল থেকে বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রায় ১৬০ মিলিয়ন ডলার করে পাবে। ১৪ বছরে এর মোট পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ২ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। ২০১৪-১৫ সালের চলমান এডিপিতে ৩১টি প্রকল্প আছে যা ওই তহবিল থেকে অর্থায়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। সুতরাং, বাংলাদেশে উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে জাপানের ভূমিকা পরীক্ষিত। সব মিলিয়ে জাপানের আগ্রহ বাংলাদেশের জন্য একটা বড় সুযোগ।

বছরে তিন হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করে জাপান। এর ৮০ শতাংশই আসে চীন থেকে। এক্ষেত্রে সদ্যবিদায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল মাত্র ৫৭ কোটি ডলার, অর্থাৎ দেড় শতাংশের মতো। আগের অর্থবছরে তা ছিল ৪৭ কোটি ডলার। রপ্তানি পণ্যের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হলে জাপানের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক আর চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বড় বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব।

জাপানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে শূন্য শুল্ক সুবিধা আছে। চীন থেকে জাপানি বিনিয়োগ হ্রাসের সাথে সাথে জাপানের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য বাড়তি সুযোগ সৃষ্টি হবে। বাংলাদেশ হবে জাপানের জন্য চীনের বিকল্প। গত পাঁচ বছরে জাপানে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ১০ গুণ বেড়েছে। জাপানি ভোক্তদের জন্য উচ্চ মানসম্পন্ন পণ্য ক্রয়ে দক্ষিণাঞ্চলের জাপানি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব হিসেবে বাংলাদেশ জাপানি বিনিয়োগে প্রস্তুত পণ্য জাপানে রপ্তানির এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে, আস্থার সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে বজায় রেখে, জাপানের প্রস্তাবিত বিনিয়োগ প্রস্তাব দ্রুত বিচার-বিবেচনা করা এখন বাংলাদেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। এখন কেবল প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে, পরে উভয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা শুরু হবে, সম্ভাব্যতা যাচাই হবে। প্রস্তাব বাস্তবায়নের প্রায়োগিক দিকগুলো আলোচনার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় পূর্বপ্রস্তুতি

থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের হোম-ওয়ার্কের অভাব বা বিলম্বিত প্রতিক্রিয়ায় জাপানের আগ্রহ হ্রাস হতে পারে। জাপানের সামনে চীনের বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে বাংলাদেশের পাশাপাশি কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামেরও আগ্রহ আছে। তাই, আমরা যদি উদ্যোগী না হই, তাহলে সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। জাপানি কর্মকর্তারা বলেছেন যে, তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগের উন্নত পরিবেশ দেখতে চায়। বিনিয়োগের পরিবেশ নিশ্চিত করা, নীতি-ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীরা যাতে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস পান, বাংলাদেশ সরকারকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

অতীতে আমরা দেখেছি, বিভিন্ন কারণে বড় বিনিয়োগ আকর্ষণে ও বাস্তবায়নে আমাদের সমস্যা রয়েছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা ফিরে গেছে। জাপানিরা এসব বিষয়ে খুব স্পর্শকাতর; সুশাসন ও দুর্নীতির প্রশ্নে তারা অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা দুর্নীতির কারণে, অর্থনীতির দৃষ্টিকোণের বাইরের অন্য কোনো বিবেচনা থেকে বা প্রভাবশালী কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে কিছু করতে গেলে জাপানি বিনিয়োগকারীদের বর্তমান উৎসাহে ভাটা পড়বে। এসব বিষয়ে নীতি-নির্ধারকদের প্রথম থেকেই সতর্ক থাকতে হবে।

বাংলাদেশকে এখন বহুমাত্রিকভাবে এগিয়ে যেতে হবে। জাপানের সঙ্গে সহযোগিতার দিকে নজর দেওয়ার সাথে সাথে ভারত, চীনসহ অন্যান্য সহযোগী দেশগুলোর সাথেও সমান্তরালভাবে অর্থনৈতিক, বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও যোগাযোগের সুযোগগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে; আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। এ সব কিছুকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেখতে হবে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। যে সুযোগের জানালা বাংলাদেশের সামনে উন্মোচিত হয়েছে, সর্বোচ্চ সুবিধা নিয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে তাকে ব্যবহার করতে হবে।

প্রথম আলো
৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ

ফাহমিদা খাতুন

সম্প্রতি জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ করার আশ্বাস দিয়ে গেছেন। কিছুদিন আগে সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। সেখানেও বাংলাদেশে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য অনেক বক্তব্য দেওয়া হয়েছে। এই সবই বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য সুখবর। কেননা বিশ্বায়নের এই যুগে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের একটি অন্যতম উপায় হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগপ্রবাহ সচল রাখা। অনেক ক্ষেত্রেই স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) দাতা এবং গ্রহীতা উভয় দেশের জন্যই লাভজনক। গ্রহীতা দেশগুলো এফডিআইয়ের মাধ্যমে মূলধন এবং প্রযুক্তি গ্রহণের সুযোগ পায়। এর মাধ্যমে এই দেশগুলো বিভিন্ন বিদেশি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। অন্যদিকে এফডিআইয়ের মাধ্যমে দাতা দেশগুলো খুব সহজেই অন্য দেশের বাজারে প্রবেশের সুযোগ পায়। সেই সঙ্গে তারা পায় প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সহজলভ্যতা, বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় প্রবেশ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ বাড়ানোর সুযোগ। একই সঙ্গে রপ্তানিজনিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সুযোগ পাওয়া যায়, যেমন – পরিবহন খরচ হ্রাসের সুযোগ। এছাড়াও আছে নিজ দেশে অর্থ পাঠানো এবং তা নিজ মুদ্রায় পরিবর্তনের সহজ সুযোগ।

একটি দেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বাজার সম্প্রসারণ, মজুরি, বাণিজ্যের পরিমাণ এবং অবকাঠামো নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। বাংলাদেশে ১৯৮০ সাল থেকেই এফডিআইবান্ধব নীতি চালু রয়েছে। যেটি অন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে অনেক আগে প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবর্তন এবং সংরক্ষণ নীতি ১৯৮০ অন্যতম। বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ কাঠামো যথেষ্ট

সহনশীল ও বিনিয়োগ উপযোগী, যা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহী করে তোলার জন্য উপযুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর মওকুফ, দক্ষ জনশক্তির ওয়ার্ক পারমিট এবং তাদের বেতনের প্রায় অর্ধেক নিয়ে যাওয়ার সহজ সুযোগ প্রদান।

তবে কিছু বিদেশি বিনিয়োগের আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে এখনো কয়েকটি বড় বাধা রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো অবকাঠামোগত সুবিধার স্বল্পতা, দক্ষতার অভাব এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।

অবকাঠামোর ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাসের যোগান এবং উন্নত রাস্তাঘাট অপরিহার্য। জনশক্তির ক্ষেত্রে যদিও বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তির ব্যাপক অভাব রয়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা দেখতে চায় তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের নিরাপত্তা কতটুকু রয়েছে, বিনিয়োগ করে তারা অর্থ ফেরত পাবে কি না। আরেকটি উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা একদিকে যেমন জমির স্বল্পতা, অন্যদিকে জমির স্বচ্ছ রেকর্ড ব্যবস্থার দুর্বলতা। একটি আধুনিক পদ্ধতিতে জমির মালিকানায় স্বচ্ছতা থাকা একান্ত অপরিহার্য। আরেকটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো, সুশাসনের অনুপস্থিতি। সস্তা শ্রম এবং সেবা খাতে অন্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশে সুবিধা বেশি পাওয়ায় বিনিয়োগকারীরা এই দেশকে লাভজনক বলে মনে করছেন। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা এবং স্বচ্ছতার অভাবের মতো পরিস্থিতির জন্যও এফডিআইপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এফডিআইয়ের পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি এফডিআই বহুমুখী করাও গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯০ সালের দিকে পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপের দেশগুলো বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ব্যবসাবান্ধব উপাদানগুলোর সর্বজনীনতা এবং বিশ্ব শ্রমবাজারের তুলনায় সস্তা শ্রমের কারণে তারা আগ্রহী হয়। সম্প্রতি দেখা গেছে এফডিআই প্রধানত প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, গুদামজাত, যোগাযোগ, বাণিজ্য-বিপনন, জ্বালানি, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামের মতো ক্ষেত্রগুলোতে বেশি আসছে। কৃষি, নির্মাণ ও সেবা খাতে এফডিআইয়ের ভূমিকা এখনো স্বল্প।

স্থানীয়ভাবে পণ্য উৎপাদন, কাঁচামালের যোগান, স্বচ্ছতার সঙ্গে সেবা প্রদান এবং কর্মসংস্থানের ওপর এফডিআই নির্ভর করে। স্থানীয় ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও তাদের অর্থ বিনিয়োগ করতে ভরসা পায়। এফডিআই বাড়ানো এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে পর্যাপ্ত অর্থায়নের মাধ্যমে স্থানীয় ব্যবসা সম্প্রসারণও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে অর্থনৈতিক কূটনৈতিক কার্যক্রম

পরিচালনাও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। এই কাজটি সরকার এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা মিলে করতে পারেন।

কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এফডিআইয়ের প্রভাব বাড়াতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারীদের আগ্রহী করে তুলতে হবে। অধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় এমন খাতগুলোতে এফডিআই প্রয়োজন। অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগ বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ এ খাতের ওপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশের উন্নয়ন। দুর্বল অবকাঠামো সুবিধার কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তবে এটিও বিনিয়োগের অন্যতম খাত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তৈরি পোশাক শিল্প ছাড়াও সিরামিক, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া, কৃষিজাত পণ্য, ওষুধ এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পেও বিদেশি বিনিয়োগ হতে পারে।

নানা রকম বাধা-বিপত্তি এবং সমস্যা, যেমন – প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার, রাজনৈতিক অস্থিরতা, উৎপাদনের উপকরণের স্বল্পতা ইত্যাদিতে জর্জরিত থাকার পরও বাংলাদেশ বেশ কিছু ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে। কৃষি, রেমিট্যান্স এবং তৈরি পোশাক শিল্পের মতো বলিষ্ঠ খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থানকে আরও উন্নত করতে চাইলে বিনিয়োগ বাড়ানোর বিকল্প নেই। পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পথে অন্যতম বাধা।

বিশ্বে সবচেয়ে কম মজুরির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জনাধিক্যের এই দেশে অধিক মুনাফা অর্জনের একটি বড় বাজার রয়েছে। বিগত চার দশকে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে একটি সাহায্য-নির্ভর দেশ থেকে বাণিজ্য-নির্ভর দেশে পরিণত হচ্ছে। দেশের জিডিপিতে বিদেশি সাহায্যের পরিমাণ কমছে, আর বাণিজ্যের অংশ বাড়ছে। আমদানি, রপ্তানি, রেমিট্যান্সপ্রবাহ, এফডিআই ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা বিশ্ব অর্থনীতির সাথে ক্রমশ অধিক হারে যুক্ত হচ্ছি। এফডিআইয়ের জন্যও যথেষ্ট সম্ভাবনাময় একটি দেশে পরিণত হচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সম্ভাবনার কথা বর্তমানে দেশে-বিদেশে স্বীকৃত। যেমন গোল্ডম্যান স্যাক্স আগামীতে এগারোটি সম্ভাবনা দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও আগ্রহ দেখাচ্ছে, নীতি-নির্ধারকদের এই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য।

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

বিমসটেক: পারস্পরিক সহযোগিতার এক নতুন দিগন্ত

মোস্তাফিজুর রহমান

ভূমিকা

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে একটি আঞ্চলিক উদ্যোগের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হল ঢাকায় বিমসটেক-এর (BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) স্থায়ী সচিবালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ঢাকায় সচিবালয় স্থাপন এ অঞ্চলের সম্ভাবনাময় দেশগুলোর মধ্যে একটি সমন্বিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রত্যয়ের যেমন প্রকাশ, তেমনি বিমসটেকভুক্ত দেশগুলোর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবদানেরও স্বীকৃতি। আশা করা যায়, আঞ্চলিকতাবাদ ও বিশ্বায়নের এই যুগে বিমসটেক সচিবালয় এর সদস্যভুক্ত দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ১৯৯৭ সালের ৬ই জুন থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড এই চারটি দেশ নিয়ে এর প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তৈরি হয় যার নাম দেওয়া হয় BIST-EC। ১৯৯৭ সালে মিয়ানমার নতুন সদস্য হিসেবে যোগদান করার পর এর নতুন নামকরণ হয় BIMSTEC। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নেপাল ও ভুটান সদস্য হিসেবে যোগ দেওয়ার পর চূড়ান্তভাবে এই জোটের নামকরণ করা হয় BIMSTEC। বিমসটেক ১৯৯৭ সালে সহযোগিতার ছয়টি ক্ষেত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীতে আরও আটটি নতুন ক্ষেত্র যোগ হওয়ায় বর্তমানে তা বেড়ে ১৪-তে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে বিমসটেকের সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়ে বৃহত্তর পরিসরে পদার্পণ করেছে।

বিমসটেক অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রায় ১.৬ বিলিয়ন, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। অন্যদিকে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মোট জিডিপির পরিমাণ বিশ্ব জিডিপির মাত্র ৪ ভাগ (২০১২) এবং মোট বাণিজ্যের পরিমাণ বিশ্ব বাণিজ্যের মাত্র ৩.৮ ভাগ (প্রায় ১.৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার)। একইভাবে বিমসটেকভুক্ত সাতটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরও আবার এক রকম নয়। তাদের মধ্যে তিনটি (ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড) উন্নয়নশীল দেশ এবং চারটি (বাংলাদেশ, মায়ানমার, ভুটান ও নেপাল) স্বল্পোন্নত দেশ। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে আবার ভুটান ও নেপাল স্থলবেষ্টিত দেশ।

বিমসটেক সহযোগিতা সার্ক ও আসিয়ানের মধ্যে এক সেতুবন্ধ রচনা করেছে। এর সাতটি সদস্য দেশের মধ্যে রয়েছে পাঁচটি সার্কভুক্ত দেশ (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলংকা) ও দুটি আসিয়ানভুক্ত দেশ (থাইল্যান্ড ও মিয়ানমার)। বিমসটেক একদিকে যেমন সার্ক সদস্য-দেশগুলোকে পূর্বমুখী আসিয়ানের বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোকেও পশ্চিমমুখী সার্কের বাজারে প্রবেশের সুযোগ এনে দিয়েছে। এভাবে পারস্পরিক স্বার্থের নিকট সম্মিলন বিমসটেক সদস্য-দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সহযোগিতার সম্পর্ককে আরও ব্যাপক ও গভীরে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

বিমসটেকের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে রয়েছে বিশেষায়িত টাস্কফোর্স, ওয়ার্কিং গ্রুপ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের (সচিব পর্যায়ের) সভা, মন্ত্রী পর্যায়ের (পররাষ্ট্র মন্ত্রী) সভা এবং শীর্ষ সম্মেলন। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত তিনটি শীর্ষ সম্মেলন প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে জোটকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বিমসটেক: গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহ

৬ জুন ১৯৯৭
'ব্যাংকক ঘোষণা' গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে BIST-EC-এর আনুষ্ঠানিক জন্মলাভ

২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭
নতুন সদস্য হিসেবে মিয়ানমারের যোগদান এবং BIMST-EC হিসেবে জোটের নতুন নামকরণ

ফেব্রুয়ারি ২০০৪
বিমসটেক মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠন সংক্রান্ত কাঠামো চুক্তি স্বাক্ষর

৩১ জুলাই ২০০৪
থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে প্রথম বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠান

১৩ নভেম্বর ২০০৮
ভারতের নয়াদিল্লীতে দ্বিতীয় বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠান

৪ মার্চ ২০১৪
মিয়ানমারের রাজধানী নে পি ত'-তে তৃতীয় বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠান
শীর্ষ সম্মেলনে ঢাকায় বিমসটেকের স্থায়ী সচিবালয় স্থাপন সংক্রান্ত সংঘ স্মারক, ভারতের নয়াদিল্লীতে আবহাওয়া ও জলবায়ু কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সংঘ স্মারক এবং ভুটানে সাংস্কৃতিক শিল্প কমিশন ও সাংস্কৃতিক শিল্প অবজারভেটরি স্থাপন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪
বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকায় বিমসটেক-এর স্থায়ী সচিবালয় স্থাপন

আঞ্চলিক সহযোগিতা বর্তমান বিশ্বে আন্তঃআঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অর্থনীতিকে সমন্বিতকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ বিমসটেক অঞ্চলে সহযোগিতা জোরদার করার মাধ্যমে তার ভূ-কৌশলগত অবস্থানের পুরো সুবিধা আদায় করতে পারে। বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন, জ্বালানিবিষয়ক সহযোগিতা ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ লাভবান হতে পারে। এছাড়া সদস্য-দেশগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করলে বাণিজ্য ঘাটতি, বিনিয়োগ বাধা ও যোগাযোগ ঘাটতির মতো গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সাফল্য লাভ করবে। তদুপরি পারস্পরিক সহযোগিতায় উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমেও সদস্য-রাষ্ট্রগুলো লাভবান হবে বলে আশা করা যায়।

বিমসটেকের মূল উদ্দেশ্য হলো এ অঞ্চলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও তা বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, কারিগরি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে ছয়টি সহযোগিতার ক্ষেত্র, যথা – বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রযুক্তি,

পরিবহন ও যোগাযোগ, মৎস্য, জ্বালানি এবং পর্যটনকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এসব ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রকল্প চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পরবর্তীতে আরও আটটি নতুন খাত যোগ করা হয়েছে। এগুলো হলো কৃষি, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জনস্বাস্থ্য, জনগণের মধ্যে যোগাযোগ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, আন্তঃআঞ্চলিক অপরাধ ও সন্ত্রাস রোধ, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি। প্রত্যেক সদস্য-দেশকে কিছু কিছু সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রধান সমন্বয়কারী দেশ (lead country) হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেমন – বাংলাদেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধান সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করছে। যদিও বিমসটেকের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, সহযোগিতার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সুফল অর্জনের জন্য উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাও এখানে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

বিমসটেক অঞ্চলে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বর্তমান চিত্র

বিমসটেকভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে রয়েছে ব্যাপক ব্যবধান। বিমসটেক সদস্য-দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ তাদের বৈশ্বিক বাণিজ্যের মাত্র ৪.২ ভাগ। তাদের বাণিজ্যিক পণ্যের মধ্যে রয়েছে কাঁচামাল, কৃষিপণ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তৈরি সামগ্রী। বিভিন্ন পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, বিমসটেক অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ বিগত দশকে কিছুটা বাড়লেও তা এখনও সম্ভাবনার তুলনায় নগণ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, বিমসটেকের অধিকাংশ সদস্যই বিভিন্ন আঞ্চলিক জোটের সদস্য এবং তারা বিভিন্ন চুক্তির আওতায় এসব দেশের বাজারে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশ সুবিধা পেয়ে থাকে। তাছাড়া এদের অনেকেই Most Favoured Nation (MFN) মর্যাদা ভোগ করার কারণে বিভিন্ন দেশ থেকে আরও বেশি শুল্ক সুবিধা পেয়ে আসছে। বিভিন্ন দেশ ও জোটের বাণিজ্য উদারীকরণ নীতির কারণে তাদের সাথে এসব দেশের অর্থনীতি অনেক বেশি উন্মুক্ত। এরপরও এ অঞ্চলে বাণিজ্যপ্রবাহ ও অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগপ্রবাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আন্তঃদেশীয় পদক্ষেপের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে থাইল্যান্ড ও ভারতের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগের ঊর্ধ্বমুখী ধারা লক্ষণীয়।

সদস্য-দেশগুলোর মধ্যে বিনিয়োগ খাতে বিদ্যমান উদারীকরণ সত্ত্বেও স্বল্প আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের মূল কারণ হলো নিম্ন আন্তঃআঞ্চলিক বিনিয়োগপ্রবাহ। বিদ্যমান দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, দুর্বল অবকাঠামো, বহুমুখী পরিবহন ব্যবস্থার ঘাটতি, বাণিজ্যসহায়ক ব্যবস্থার অভাব এ অঞ্চলে আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধির অন্যতম অন্তরায়। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সদস্য-দেশগুলোর জনগণের মধ্যে যোগাযোগ

বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অনেক সদস্য-দেশের "দেশীয় শিল্প রক্ষা" নীতির কারণে বিভিন্ন সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সেবা খাত তেমন বিকশিত হয়নি। এছাড়া এ ধরনের সংরক্ষণমূলক নীতি প্রযুক্তি, সেবা ও দক্ষতার প্রভৃতি বিনিময় ও বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে।

আশার বিষয় হলো, বিমসটেক ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সভা, মন্ত্রী পর্যায়ের সভা ও শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনার মাধ্যমে জোটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

বিমসটেক সদস্য-দেশগুলো বিদ্যমান সহযোগিতার সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে ইতিমধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং আরও কিছু পদক্ষেপ বিবেচনাধীন আছে। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে মিয়ানমারের রাজধানী নে পি ত-তে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে বিমসটেকের স্থায়ী সচিবালয় স্থাপন, দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে খাতভিত্তিক সহযোগিতা জোরদার এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

বিমসটেক-এর আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগ

বিমসটেক-এর অন্যতম লক্ষ্য হলো একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠন করা। ২০০৪ সালে স্বাক্ষরিত বিমসটেক মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠন সংক্রান্ত কাঠামো চুক্তিটিতে পণ্য বাণিজ্য ছাড়াও সেবা ও বিনিয়োগ খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী সদস্য-দেশগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ট্যারিফ শিডিউলের ক্ষেত্রে বাণিজ্য উদারীকরণ ব্যবস্থাসহ উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের জন্য ডিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে।

বিগত বছরগুলোতে বিমসটেক ঘোষিত বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও সদস্য-দেশগুলোর পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রী পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পররাষ্ট্র, বাণিজ্য, সংস্কৃতি, জ্বালানি, পর্যটন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রী পর্যায়ের সভা। এসব সভার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন বিষয়ে অর্থনৈতিক এবং খাতভিত্তিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা। এছাড়া গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং বিমসটেক ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যবৃন্দ নিয়মিতভাবে বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন। তাই দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন পর্যায়ের সভায় গৃহীত এসব সিদ্ধান্তের দ্রুত ও সফল বাস্তবায়নই হলো

বিমসটেক-এর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বিমসটেক সচিবালয় এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে সহযোগিতার যে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে তাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বিমসটেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে সদস্য-রাষ্ট্রগুলো বঙ্গোপসাগর অঞ্চলবর্তী বিস্তৃত পশ্চাৎভূমি এবং এর বাইরে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হতে পারে।

বিমসটেক মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠনে চলমান আলোচনার দ্রুত ও সফল সমাপ্তি বিমসটেক অঞ্চলে বাণিজ্য ও সেবা খাতের সহযোগিতাকে আরও বেগবান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া BCIM-EC (Bangladesh, China, India, Myanmar Economic Corridor) উদ্যোগের সাথে যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে বিমসটেক উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ চট্টগ্রামের সোনাদিয়ায় প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দরের মতো বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা গেলে BCIM- Economic Corridor, বিমসটেক, সার্ক, আসিয়ানের মধ্যে আন্তঃআঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাবে। তাছাড়া বিমসটেক মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলবিষয়ক কাঠামো চুক্তি বাস্তবায়নে যে 'রোড ম্যাপ' গ্রহণ করা হয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলে পণ্য, সেবা ও বিনিয়োগের অবাধ যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তবে এর সুফল পেতে হলে সদস্য-দেশগুলোকে বিদ্যমান স্থলবন্দরগুলোর কাস্টমস্ হাউসের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ইলেকট্রনিক তথ্য বিনিময়, বিভিন্ন স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি বিধি-বিধানের সমন্বয়করণ, পণ্যমান নিয়ন্ত্রণ, প্রত্যয়ন, ডকুমেন্টেশন ও সদস্য-দেশগুলোর মধ্যে একক সার্ভিস সেন্টার তৈরি প্রভৃতি বাণিজ্যসহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সদস্য-দেশগুলো বিদ্যমান অশুল্ক বাধা দূরীকরণসহ এতদঞ্চলে যাতায়াত সহজীকরণের লক্ষ্যে মোটর ভেহিকেলস চুক্তি স্বাক্ষরের কথাও ভেবে দেখা যেতে পারে – যা বিশেষ করে স্থলবেষ্টিত দেশগুলোর বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এসব পদক্ষেপ বিমসটেক অঞ্চলকে দ্রুত অর্থনৈতিক সংহতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বর্তমান প্রেক্ষিতে বিমসটেক বাংলাদেশের জন্য আসিয়ানের প্রবেশদ্বার স্বরূপ। আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও গভীর ও দৃঢ় করাসহ আসিয়ান বাজারে বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশের ক্ষেত্রে বিমসটেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশের ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে এবং বিমসটেককে উপজীব্য করে বঙ্গোপসাগরের বিশাল সম্পদরাশির সদ্ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সামুদ্রিক অর্থনীতি (Blue Economy) এক্ষেত্রে বিমসটেক-এর পরবর্তী সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে তার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিমসটেক সদস্য-দেশগুলোর দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং এ অঞ্চলের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সামুদ্রিক খনিজ, মাছ ও অন্যান্য সম্পদ আহরণের জন্য দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং উন্নয়নের জন্য সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা নেওয়া হলে তা কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই বয়ে আনবে না, এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে গভীর আস্থা ফেরাতে সহায়ক হবে এবং পাশাপাশি বিমসটেক অঞ্চলকে একটি স্থায়ী, শক্তিশালী ও সম্পদশালী অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

উপসংহার

সাম্প্রতিককালে বিমসটেক সদস্য-রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করছে। এসবের মধ্যে রয়েছে জিডিপি বৃদ্ধির উচ্চহার, অর্থনৈতিক উদারীকরণ, আন্তর্জাতিক সংহতি জোরদার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ। তবে এই অগ্রগতি ও সাফল্য ধরে রাখতে হলে সদস্য-দেশগুলোকে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতাভিত্তিক আঞ্চলিক সরবরাহ ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করাসহ একবিংশ শতাব্দীর নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। ঢাকায় বিমসটেক-এর স্থায়ী সচিবালয় প্রতিষ্ঠা বিমসটেক নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে এ অঞ্চলকে একটি শান্তি, সমৃদ্ধি, বন্ধুত্ব এবং অংশীদারিত্বমূলক অঞ্চলে রূপান্তরের যৌথ অঙ্গীকারের পরিচায়ক। তবে মনে রাখতে হবে যে, দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হলে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। বিমসটেক সচিবালয়কে এ লক্ষ্যে প্রধান ভূমিকা রাখতে হবে, কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর তা করা সম্ভব হলে যে অঙ্গীকার নিয়ে এ আঞ্চলিক উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তা সার্থক হবে। আশা করা যায়, সদস্য-দেশসমূহের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিমসটেক সচিবালয় এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি উদ্যমী ও কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে।

প্রথম আলো
১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

মার্কিন বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা বাংলাদেশের ন্যায্য দাবি

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের শুল্ক দেওয়া না দেওয়া নিয়ে কয়েক দিন ধরেই বেশ বিতর্ক চলছে। এ বিষয়ে সকালের খবরকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, দৃশ্যত বাংলাদেশ আমেরিকাকে সরাসরি শুল্ক না দিলেও উৎপাদকদের মাধ্যমে সেটা নিচ্ছেন মার্কিন আমদানিকারকরা। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া বাংলাদেশের ন্যায্য দাবি বলে তিনি মনে করেন। এ বিষয়ে তিনি আরও অনেক কথা বলেছেন। তার সাক্ষাৎকারের বিশেষ অংশ নিচে দেওয়া হল।

সকালের খবর: সম্প্রতি রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজিনা বলেছেন, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক তার দেশকে কোনো শুল্ক দেয় না। তার এ বক্তব্যের পর সরকার এবং উদ্যোক্তা পর্যায়ে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। আপনি তৈরি পোশাকসহ আমদানি-রপ্তানি নিয়ে গবেষণামূলক অনেক কাজ করেন। এই বিতর্ক নিয়ে আপনার অভিমত কী? আমেরিকার সঙ্গে শুল্কের বিষয়টা আসলে কী?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: শুল্ক প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী একটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া রয়েছে। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়, বিশ্বের যেকোনো দেশের জন্যই প্রক্রিয়াটি প্রায় একই রকম। যেকোনো দেশের আমদানিকারক পণ্য আমদানি করলে তার শুল্ক আমদানিকারকই দিয়ে থাকে। কিন্তু শুল্কের কারণে পণ্যের ব্যয়ের ওপর যে চাপ পড়ে

সে ব্যয়টি কে বহন করবেন সেটা নির্ভর করে পণ্য উৎপাদন চেইনে যারা জড়িত তারা কে কার ওপর ঠেলে দিতে পারছেন তার ওপর। অর্থাৎ যেকোনো পণ্যের শুল্ক যদি ১০ শতাংশ ধরি, এই শুল্কের কারণে পণ্যমূল্য নিয়ে ভোক্তা পর্যায়ে সেটির প্রতিক্রিয়া হবে কিনা সেটি নির্ভর করবে ওই পরিমাণে ট্যারিফ পণ্যের সঙ্গে যুক্ত করলে সেটি বিক্রয়যোগ্য হবে কি হবে না তার ওপর। সুতরাং এটি খুব সহজভাবে বলার সুযোগ নেই যে ট্যারিফটি একজন আমদানিকারক দিচ্ছেন, সেটি ভোক্তাই দিচ্ছেন – এমনটি সব সময় ঘটে না। বরং পণ্যের সংবেদনশীলতার ওপর ভিত্তি করে ভোক্তা কতটুকু দেবেন তা নির্ভর করে। একটি পণ্যের ট্যারিফ সমগ্র উৎপাদন চেইনের একটি অংশ। সুতরাং এটিকে আলাদাভাবে আমদানি পণ্যের অংশ হিসেবে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর ট্যারিফ বসানোর ফলে ভোক্তা যদি মনে করেন তিনি উচ্চমূল্যের পণ্য কিনবেন না, তাহলে তিনি সেখান থেকে সরে আসবেন। যদি ক্রেতা সরে যান তাহলে পণ্যটি আর সেখানে বিক্রি হবে না। যদি তাই হয়, তাহলে বাংলাদেশ থেকে পণ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে সে দেশের আমদানিকারকদের এক রকম অনাগ্রহ দেখা দেবে। সেজন্য আমরা দেখছি বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর শুল্ক থাকার কারণে সে দেশে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির শেয়ার কমে আসছে। এর বিপরীতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের শেয়ার বাড়ছে। তার একটি বড় কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত সুবিধা পায়। এর ফলে আমরা বলতে পারি শুল্কমুক্ত সুবিধা থাকার কারণে বাংলাদেশি পণ্য ইউরোপীয় ভোক্তারা কম মূল্যে পাচ্ছেন বলে গ্রহণ করছেন। কিন্তু শুল্ক থাকার কারণে এবং পণ্যমূল্য বেশি হওয়ার কারণে মার্কিন ভোক্তারা বাংলাদেশি পণ্য বেশি গ্রহণ করছেন না। অবশ্য যে ট্যারিফটি একজন আমদানিকারক দিয়ে থাকেন, সেটি আসলে ভোক্তা পর্যায় থেকে সেভাবে নেওয়া হয় না। সেটা হয় ওই আমদানিকারক বহন করেন অথবা বিভিন্নভাবে সেটি উৎপাদকের কাছ থেকে নেওয়া হয়। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বাংলাদেশ থেকে পণ্য নেওয়ার সময় মার্কিন আমদানিকারকরা শুল্কের বিষয়টি নিয়ে বেশ ভালোভবেই বিবেচনা করেন।

সকালের খবর: ড্যান মজিনা নিশ্চয় জানেন শুল্ক নেওয়ার বিষয়টি। তাহলে তিনি কেন এ ধরনের মন্তব্য করলেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং বাণিজ্যমন্ত্রী শুল্কের বিষয়টি নিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে উভয়ের কথারই আংশিক যৌক্তিকতা রয়েছে, আবার

আংশিক যৌক্তিকতা নেই। ড্যান মজিনার বক্তব্যের আংশিক যৌক্তিকতা হচ্ছে – এই ট্যারিফ বা শুল্ক আমেরিকা সরাসরি বাংলাদেশ থেকে নিচ্ছে না। এই শুল্ক নেওয়া হচ্ছে আমদানিকারক পর্যায়ে। কেননা আমদানিকারক বাংলাদেশ থেকে পণ্য নেওয়ার সময় শুল্কসহ সব কিছু মিটিয়েই নিয়ে যান। সেদিক থেকে বললে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের আংশিক যৌক্তিকতা রয়েছে। কিন্তু একটি জায়গায় তথ্যের কিছু ঘাটতি রয়েছে। সেটি হচ্ছে – তিনি বলেছেন, মার্কিন ভোক্তারাই বাড়তি মূল্যটি পুরোপুরি দেন। তার এই কথাটি ঠিক নয়।

এর বিপরীতে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের বক্তব্যেরও আংশিক যৌক্তিকতা রয়েছে। কারণ কার্যকর অর্থে এর দায় বাংলাদেশের ওপর পড়ছে। হয়তো প্রক্রিয়াগতভাবে এখান থেকে শুল্ক নেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু দেশের উৎপাদক পর্যায় থেকে এটা ভিন্ন আঙ্গিকে নেওয়া হচ্ছে। সেই অর্থে বাণিজ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের যৌক্তিকতা রয়েছে। আর দেশের উৎপাদকরা যদি দেখেন যে মার্কিন বাজারে তাদের পণ্য রপ্তানি করা প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে তারা বাড়তি শুল্ক মেনে নিয়েই রপ্তানি করবেন বা করছেন। অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমদানিকারক হয়তো নিজে অর্ধেক দিচ্ছেন আর উৎপাদক অর্ধেক দিচ্ছেন। এর ফলে ভোক্তা পর্যায়ে পণ্যের দাম আর বাড়ছে না। তবে এই ট্যারিফের কারণে কে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেটি দেখলে বোঝা যায় যে, এর কারণে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কেননা এই ট্যারিফের কারণে মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ইউরোপীয় বাজারের তুলনায় কম।

সকালের খবর: উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মার্কিন বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ার কথা। সে সুবিধা তো দেওয়া হচ্ছে না। এ বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে মার্কিন বাজারে গার্মেন্ট পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধা বিশ্বের অনেক দেশ পাচ্ছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্ত্বে বাংলাদেশ সে সুবিধা পাচ্ছে না। এই জায়গায় বাংলাদেশের একটা ন্যায্য দাবি রয়েছে। এই দাবিটা বাংলাদেশ জোরালোভাবে করতে পারে। মার্কিন বাজারে এই শুল্কমুক্ত সুবিধা না থাকার কারণে সে দেশে আমাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ঘটছে না। অথচ ইউরোপের বাজারে আমাদের পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ঘটছে। এই পার্থক্যের প্রধান কারণই হচ্ছে উচ্চশুল্ক। মার্কিন বাজারে যদি এই সুবিধা বাংলাদেশকে দেওয়া হতো, তাহলে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের যে ৫-৬ শতাংশ শেয়ার রয়েছে, সেটি তখন অনেক বেড়ে যেত। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ তখন চীনের অনেক কাছাকাছি চলে যেত। এই সুবিধা যদি বাংলাদেশকে দেওয়া হতো,

তাহলে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে আরও কর্মসংস্থান হতো, দারিদ্র্য দূর করা যেত এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অনেক উন্নতি ঘটানো যেত।

সকালের খবর
১৬ নভেম্বর ২০১৪

সাক্ষাৎকার: এসএম আলমগীর

অধ্যায় ৬

স্মরণ

ড. এম রহমতউল্লাহ: দেশের উন্নয়নে তাঁর অবদান স্মরণীয়

মোস্তাফিজুর রহমান

গত ২৮ মে প্রখ্যাত যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ড. এম রহমতউল্লাহ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের যে ক্ষতি হয়েছে, আক্ষরিক অর্থেই তা পূরণ হওয়ার নয়। বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া ও বৃহত্তর এশীয় অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার নৈকট্য স্থাপনের বহুমুখী প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের সঙ্গে চার দশক ধরে ড. রহমতউল্লাহর নাম ছিল অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। ব্যক্তি ড. রহমতউল্লাহর মৃত্যু যেমন আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক, তেমনি যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ড. রহমতউল্লাহর মৃত্যুও আমাদের জন্য অপূরণীয় অনুপস্থিতি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দেশের মধ্যকার আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, জ্বালানিসাশ্রয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ, যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ – এমনি বহুমাত্রিক বিষয়ে তাঁর বিস্তৃত জ্ঞানকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন যথোপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে। দক্ষিণ এশিয়া ও বৃহত্তর এশীয় অঞ্চলের যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে বাংলাদেশের স্বার্থ, গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ও অংশীদারিত্ব যাতে নিশ্চিত থাকে, সে বিষয়ে সবসময় তিনি ছিলেন সজাগ ও সচেতন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধকতাবিহীন ও আধুনিক আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অপরিহার্যতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের পণ্য ও সেবা খাতের রপ্তানি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অনেকের আগে তিনি এ নিয়ে ভেবেছেন, গবেষণা করেছেন, লিখেছেন, কথা বলেছেন। এসব বিষয়ে তাঁর অগ্রাভিমুখী ভাবনা, দূরদৃষ্টি ও মূল্যবান অবদানের জন্য আমরা তাঁর কাছে সব সময়ই ঋণী থাকব। যথার্থ অর্থেই এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন অগ্রপথিক।

মেধার স্বাক্ষর ড. রহমতউল্লাহ রেখে গেছেন তাঁর কৃতি ছাত্রজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বুয়েটেরই শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি চলে যান যুক্তরাজ্যের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখান থেকে ১৯৬৬ সালে মাস্টার্স অব সিভিক ডিজাইন এবং ১৯৬৮ সালে ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানিং-এর ওপর পিএইচডি করেন। বুয়েটে ১৯৬৮ সালে আরবান ও রিজিওনাল প্ল্যানিং বিভাগের যাত্রা হলে তিনি এ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসেবে যোগ দেন। এরপর চলে যান বাংলাদেশ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে, যেখানে তিনি কর্মরত ছিলেন অবকাঠামো ও যোগাযোগ বিভাগের জয়েন্ট চিফ হিসেবে। কর্মজীবনের পরবর্তী ধাপে তিনি যোগদান করেন জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক (এসকাপ)-এ যেখানে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০০০ সালে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এসকাপে কর্মরত অবস্থায় এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমন্বিত সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন ও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে মূল্যবান অবদান রাখেন। এ সময় এশিয়ান হাইওয়ে ও রেল নেটওয়ার্কের রুট-নির্ধারণ, এক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রয়োজনীয়তা, অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস অনুসন্ধান এবং এসব রুটের বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নসহ বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

এসকাপ থেকে অবসর গ্রহণের পর যোগাযোগ বিষয়ে তাঁর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করতে অধ্যাপক রেহমান সোবহান ড. রহমতউল্লাহকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেন। অধ্যাপক রেহমান সোবহানের আগ্রহে তিনি সিপিডি কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন-সম্পর্কিত গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হন এবং এতে নেতৃত্ব দেন। ২০০১ সালে সিপিডি যখন বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি-সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ১৬টি টাস্কফোর্স গঠন করে, তখন তিনি যোগাযোগ-সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৩ সালে এসব নীতি-সুপারিশ বাস্তবায়ন মূল্যায়নের লক্ষ্যে যখন আবার নতুন করে ১৭টি টাস্কফোর্স গঠিত হয়, তখনো তিনি যোগাযোগ-সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। এ সময়কালে সার্ক অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন। ঢাকা ও রাজশাহীর যোগাযোগ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সার্কের আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকল্পে তিনি বিশেষজ্ঞ হিসেবে অবদান রাখেন। বিশ্বব্যাংক ও ডিএফআইডি-র পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। ২০০৯ সালে তৎকালীন নবনির্বাচিত সরকার যখন ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা

স্থাপন ও উন্নয়নে উদ্যোগ নেয় এবং এ বিষয়ে কৌশল ও নীতি-সুপারিশ প্রণয়নের জন্য জাতীয় কমিটি গঠন করে, তখন পাঁচটি উপকমিটির একটির আহ্বায়ক হিসেবে স্থল, জল ও রেল রুট নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিকল্প কী হতে পারে তা নির্ধারণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বিসিআইএম (বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার) অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে তাঁর আগ্রহ ছিল গভীর। স্মর্তব্য যে, ১৯৯৯ সালে বিসিআইএম ফোরাম গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে পরে গবেষণাকর্ম পরিচালনা, বিসিআইএম ফোরামগুলোর আয়োজনসহ সিপিডি যেসব বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে, সেগুলোর প্রতিটিতে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। ২০১৩ সালের প্রথম দিকে কলকাতা থেকে কুনমিং পর্যন্ত যে কার শোভাযাত্রা হয়, তার আয়োজনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, সিপিডি-র সংশ্লিষ্ট-কর্মকাণ্ডে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ড. রহমতউল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক ও পরোপকারী একজন মানুষ। যারাই তাঁর সঙ্গে মিশেছেন, তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি মানুষকে কাছে টেনেছেন, তাঁর ব্যবহারে অন্যরা তাঁকে কাছে পেতে চেয়েছেন। সিপিডি-র সিনিয়র ফেলো ড. রহমতউল্লাহ ছিলেন সিপিডি পরিবারের একজন একান্ত আপনজন, অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বিশেষ স্নেহভাজন।

শেষের কয়েক বছর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেও তাঁর মুখ থেকে প্রাণবন্ত হাসি কখনো হারিয়ে যায়নি। ড. দেবপ্রিয় ও আমি যখন শেষ বিদায়ের আগে তাকে হাসপাতালে দেখতে যাই, তখনো তাঁর মুখে দেখেছি সেই অমলিন প্রশান্ত ভাব। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তাঁর অত্যন্ত আদরের তিন কন্যা ও তাদের পরিবার এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

একদিন দক্ষিণ এশিয়া ও বৃহত্তর এশীয় অঞ্চলের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠিত হবে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে হবে সব গতিপথের সম্মিলনী ভূমি, মধ্যমণি। সড়ক, রেল আর নৌ-পথের নিরবচ্ছিন্ন গতিধারা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রসার, উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম দিকে ধাবমান যানবাহন, মানুষের সঙ্গে মানুষের নৈকট্য – এসবের কল্যাণে দেশের অর্থনীতি হবে সমৃদ্ধ, জীবন হবে উন্নত। অনাগত সেই দিনে ড. রহমতউল্লাহকে আমাদের আরও বেশি করে মনে পড়বে।

বণিক বার্তা
২৮ জুন ২০১৪

কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আজ (৯ই অক্টোবর) জননেতা ও বাংলাদেশের বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরধা ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ ফরহাদের ২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী। প্রয়াত মানুষদের বয়স বাড়ে না। তাই মোহাম্মদ ফরহাদ আজও আমার স্মৃতিতে ৪৯ বছরের একজন পূর্ণ পুরুষ।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সম্ভবত সর্বাপেক্ষা সফল সংগঠক মোহাম্মদ ফরহাদের নাতিদীর্ঘ কিন্তু বহুমাত্রিক জীবন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে শুদ্ধ রাজনীতির দৈন্য দশার প্রেক্ষিতে তা আরও বেশি। আজ তাঁর ২৭তম তিরোধান বার্ষিকীতে অত্যন্ত সংক্ষেপে তাঁর প্রভূত অবদানের থেকে পাঁচটি বিষয় স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে।

প্রথমত আমার দৃষ্টিতে মোহাম্মদ ফরহাদ হলেন সেই প্রজন্মের প্রতিভূ, যাঁদের মাধ্যমে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্জন্ম লাভ করে। ১৯৪৭-এর প্রাক্কালে এই অঞ্চলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বে হিন্দু পরিবার থেকে আসা ব্যক্তিদেরই প্রাধান্য ছিল। সে সময় বিকাশমান নব্য মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং তাদের দ্রুত নেতৃত্বে নিয়ে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। মোহাম্মদ ফরহাদ নিজ গুণে এই উত্তরণকালীন প্রক্রিয়ার মূল ধারক ছিলেন। ১৯৫৪ সালে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে দীক্ষিত ১৬ বছরের কিশোর ৯২-ক ধারায় আট মাস জেল খাটে। আর মাত্র ৩৫ বছর বয়সে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

দ্বিতীয় যে কথাটি আরও মনে পড়ে তা হলো আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন তথা শিক্ষা আন্দোলন রূপায়নে তাঁর মেধাদীপ্ত অবদানের কথা। তিনি এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন আর ১৯৬২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পুরো সময়টাই তাঁকে হুলিয়া মাথায় নিয়ে পলাতক থাকতে হয়েছে। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানসহ স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালের সকল আন্দোলনেই ছিল তাঁর নিয়মিত অংশগ্রহণ।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, বিশেষ করে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে, বামপন্থীদের অবদানের মূর্ত প্রতীক ছিলেন মোহাম্মদ ফরহাদ। কমিউনিস্ট-ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ গেরিলা বাহিনীর তিনি ছিলেন সংগঠক ও অধিনায়ক। প্রবাসী সরকার এ সময় কমরেড মনি সিংহ ও তাঁর মাধ্যমে পেয়েছে প্রভূত সমর্থন, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। সশস্ত্র যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা তাঁর স্বাধীনতা উত্তর 'দেশ গড়া'র চেতনাকে আরও শাণিত করে তোলে।

চতুর্থত, অনেকেই মনে করেন জাতীয় রাজনীতিতে মোহাম্মদ ফরহাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো ১৯৮০-র দশকে স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনকে একটি সুস্পষ্ট অবয়ব দান। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোট ও বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোটকে একতাবদ্ধভাবে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগী ভূমিকা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। সংসদের প্রার্থীতা মনোনয়নে দুই নেত্রীর মাঝে তাঁর ৫০-৫০ আসন ভাগের প্রস্তাব সে সময় ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করে।

পঞ্চমত, এবং আমার মতে তাঁর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো সে সময় সিপিবি-কে একটি ক্যাডারভিত্তিক পার্টি থেকে জনমানুষের পার্টিতে পরিণত করা। মোহাম্মদ ফরহাদ কৃষক ও শ্রমিক ফ্রন্টকে দলের জন সমাবেশ শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক গুরুত্ব দেন। এর পাশাপাশি তিনি কমিউনিস্টদের নির্বাচনী রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং ১৯৮৬ সালে নিজে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হন। এক কথায়, তিনি নিজ দলকে জাতীয় মূলধারার রাজনীতিতে দৃশ্যমান করে তোলেন। এসব তিনি করতে সক্ষম হন যখন তিনি স্বাধীন দেশে বার বার কারাবরণ করেছেন, দল নিষিদ্ধ হয়েছে এবং কর্মীরা ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

এক কথায়, তিনি ছিলেন আশির দশকের সিপিবি-র স্বর্ণযুগের স্থপতি।

দেশে দেশে বিদগ্ধ সমাজ প্রায়শই পেছনের কথা বলতে গিয়ে ইতিহাসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ভূমিকার পুনর্বিবেচনায় ব্যাপৃত হয়। মোহাম্মদ ফরহাদও এই পশ্চাৎদৃষ্টিভিত্তিক এই বিশ্লেষণী চেষ্টার আওতার বাইরে নন। কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলবেন ১৯৭৫ সালে তাঁর নেতৃত্বে সিপিবি-র বিরাগহীনভাবে বাকশালে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে। আবার কেউ প্রশ্ন করবেন ১৯৭৭ সালের গণভোটে দলের 'হ্যাঁ' ভোট দেওয়া অথবা সে সময়ের 'খাল কাটা' আন্দোলনে যোগ দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে। প্রয়াত মানুষদের সুবিধা হলো তাঁদেরকে কোনো চলমান বিতর্কের উত্তর দিতে হয় না।

তবে আমার মতো অনেকেই, নিজের সাথে নিজের সংলাপে হয়তো প্রশ্ন করেন, মোহাম্মদ ফরহাদ যদি ১৯৯৩ সালে জীবিত থাকতেন তাহলে কি সিপিবি এরকম বহুধা বিভক্ত হতে পারতো? পৃথিবীব্যাপী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের প্রেক্ষিতে তিনি কি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগের পুনর্বিশ্লেষণ করে দলকে নতুন ভিত্তি ও কাঠামোতে সংহত করতে সক্ষম হতেন? নাকি তিনি বিশ্ব অভিজ্ঞতার নবলব্ধ নির্যাস নিয়ে বাংলাদেশের বাস্তবতায় শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে ভিন্ন কোনো রাজনৈতিক–সাংগঠনিক ধারা বা কাঠামোর কথা চিন্তা করতেন। এই প্রতিবাস্তব (counter-factual) প্রশ্নের কোনো নিশ্চিত উত্তর আছে বলে মনে হয় না। তবে এতটুকু বলতে পারি মোহাম্মদ ফরহাদের মতো প্রাজ্ঞ, নিবেদিতপ্রাণ ও কৌশলী কমিউনিস্ট দলের ব্যাপকতর সদস্যের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান হয়তো বের করতে পারতেন।

আমার সাথে মোহাম্মদ ফরহাদের পরিচয় স্বাধীনতার পর, যখন আমি ছাত্রকর্মী হিসেবে সিপিবি-র রাজনীতিতে সক্রিয়। পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের (১৯৭৩) প্রস্তুতিকালে তাঁর কাজ আমার আরও কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়। তবে তাঁর সাথে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় যখন আমি মস্কোতে অধ্যয়নরত। ১৯৮৪ সালে দেশে ফেরার পরবর্তী বছরগুলোতে এই বিরল রাজনৈতিক বীক্ষাসম্পন্ন, অতুলনীয় সাংগঠনিক ক্ষমতাধর ও ব্যাপক মানবীয় গুণাবলীসিক্ত মানুষটির সাথে প্রতিনিয়ত তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। একটাই প্রশ্ন – কোন রাজনৈতিক পথে বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষের আর্থ-সামাজিক বিকাশ নিশ্চিত হবে তা নিয়ে। কঠিন আদর্শবাদী একজন মানুষের সংবেদনশীল এই বাস্তবতাবোধ আমাকে আশ্চর্য করতো।

আজও মনে পড়ে, ১৯৮২ সালে মস্কোতে গভীর রাতের প্রলম্বিত এক আলোচনায় ফরহাদ ভাইকে প্রশ্ন করেছিলাম দলকে নিয়ে তাঁর স্বপ্ন কী? তিনি তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন – বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে কমিউনিস্টদের একটি গ্রুপ গঠন, দলের একটি নিজস্ব ভবন থেকে কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং দলের পত্রিকা 'একতা'-কে দৈনিকে

পরিণত করা। তাঁর অবশিষ্ট সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি ১৯৮৬-র নির্বাচনে সংসদে পাঁচজন সিপিবি সদস্য পান। সিপিবিকে একটি স্থায়ী ঠিকানা দেওয়াকেও তিনি নিশ্চিত করেন। এবং আশির দশকে একতা-র প্রচার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। মনে প্রশ্ন জাগে, আজ যদি দেশের বর্তমান জাতীয় ও দলীয় রাজনীতি নিয়ে আবার তাঁকে প্রশ্ন করতাম তাহলে তিনি কী উত্তর দিতেন।

ল্যাটিন ঔপন্যাসিক ইসাবেল আলেন্দের লেখায় পড়েছিলাম – "মৃত্যু বলে কিছু নেই, মানুষের মৃত্যু ঘটে যখন আমরা তাঁকে ভুলে যাই"। আজও মোহাম্মদ ফরহাদকে মনে পড়ে। তাই তাঁর মৃত্যু নেই।

প্রথম আলো
৯ অক্টোবর ২০১৪

সিপিডি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গণমাধ্যমের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করে আসছে। নীতি গবেষণার ফলাফলকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিগোচরে আনার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের যে অগ্রণী ভূমিকা আছে তা স্বীকৃত সত্য। এ কারণে সিপিডি-র গবেষকরা গণমাধ্যমে সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে কলাম লিখন, সাক্ষাৎকার প্রদান ও মন্তব্য দিয়ে নীতি গবেষণার জটিল বিষয়কে সহজবোধ্যভাবে সাধারণ জনগণের কাছে উপস্থাপন করে থাকেন। বর্তমান গ্রন্থটি এসব প্রয়াসের একটি সংকলিত প্রতিফলন।

সব নিরীখেই সদ্যসমাপ্ত ২০১৪ সাল বাংলাদেশের জন্য ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, কার্যকর গণতন্ত্রচর্চার অভাব এবং অর্থনীতির ওপর তার নেতিবাচক অভিঘাত বছর জুড়েই ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। অনিশ্চয়তার কার্যকারণে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে যে প্রভাব পড়ছে তার বিশ্লেষণ ও আলোচনা বর্তমান গ্রন্থটির একটি মূল প্রতিপাদ্য।

অর্থনৈতিক প্রবণতা ও বাজেট বিশ্লেষণ সিপিডি-র কাজের একটি ধারাবাহিক অংশ। বাজেট প্রণয়নের পূর্বে ও পরবর্তীতে বাজেটের বিভিন্ন প্রস্তাব ও তার যথার্থতা নিয়ে সিপিডি-র গবেষকরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখে থাকেন।

নারী অধিকারসহ বিভিন্ন নাগরিক অধিকার সিপিডি-র গবেষণায় সবসময়ই গুরুত্ব পেয়েছে। অর্থনীতিতে নারীদের কাজের অবদান, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার এবং মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিয়ে রচিত প্রবন্ধগুলো বর্তমান সংকলনটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

রানা প্লাজা বাংলাদেশের পোশাকশিল্প খাতের একটি ভয়াবহ স্মৃতি। দুর্ঘটনার পর থেকেই রানা প্লাজার শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য সিপিডি মাঠপর্যায়ে তথ্য আহরণ করেছে এবং গবেষণা পরিচালনা করেছে। রানা প্লাজা-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে লেখাসমূহ বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের উন্নতিকল্পে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেবে বলে আশা করা যায়।

আধুনিক বিশ্বে বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে একটি প্রধান ভূমিকা রেখে চলেছে। বৈদেশিক সাহায্য, শুল্কমুক্ত সুবিধা, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণসহ বিভিন্ন ইস্যুতে প্রকাশিত লেখাসমূহ উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী ও সাধারণ পাঠককে উপকৃত করবে।

গণতান্ত্রিক, সহনশীল, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সিপিডি-র গবেষকরা প্রতিনিয়তই কাজ করে যাচ্ছেন। তারই প্রতিফলন বইটির বিভিন্ন প্রবন্ধে। নানামুখী বিষয়ের অনন্য সম্মিলন উৎসুক পাঠকদের আগ্রহ পূরণে সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি - ৬/২ (৭ ও ৮ তলা), ব্লক - এফ
কাজী নজরুল ইসলাম রোড, লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট
ঢাকা - ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২, ৯১৪৩৩২৬, ৮১২৪৭৭০
ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৮১৩০৯৫১ ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd

9 789848 946206 >